মনোজ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা—৯

মুদ্রক : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯, এন্টনীবাগান লেন
কলিকাতা—৯

বেঁধেছেন : জি. রায় এন্ড কোং
২২, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট : শ্রীকানাই পাল
প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

মূল্য : তিন টাকা

অনুজপ্রতিম কথাকার

শ্রীমান সন্তোষকুমার ঘোষ

পরম স্নেহাস্পদেষু

= এক =

কাপাসদা'র দীঘির কথা শুনেছেন। এই। তেপান্তর জুড়ে আছে। চাঁপাতলার বাঁধাঘাট। আর আজকের দশা দেখুন। চাতাল ফেটে হাঁ হয়ে আছে। আস্ত একটা মানুষ ঢুকে যায়। শেয়ালকাঁটার জঙ্গলে পা ফেলতে পারবেন না। পা ফেলতে আসেও না কেউ এখানে। পশ্চিম পাড়ের বাঁড়ুয্যে-পাড়া একেবারে নিশ্চিহ্ন। ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুর গোপালের নিরম্বু উপোস যাচ্ছিল, তারপরে কে বুঝি হিন্দুস্থানের পারে তুলে নিয়ে গেছে। উত্তর পাড়ের কামারপাড়াটা টিমটিম করছে কোন রকমে। তা-ও কি থাকবে? কামারশালা তো এখনই গেছে। লোহা পেটানোর শক্তসমর্থ জোয়ান-পুরুষ সবাই ওপারে। আছে গোটাকতক বুড়োবুড়ি শ্মশানের দিকে মুখ তাকিয়ে। দীঘিতে তাদের আসতে হয়। চাঁপাতলার বাঁধাঘাটে নয়—খানিকটা দূরে তালের গুঁড়ি বসিয়ে হিঞ্চেকলমির দাম কেটে আলাদা ঘাট করে নিয়েছে। গুঁড়ির উপর বসে বাসন মাজে, ঘটি ভরে জল তুলে তুলে মাথায় দেয়। নেমে স্নান করবার জো নেই, গাদের মধ্যে কোমর অবধি বসে যাবে।

আমার গল্পের শুরু আগের আমলে। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হল, তার অনেক আগে। শান-বাঁধানো ঘাট তখন ঝকঝক করে। তারা কামারনীর মেয়ে টুনিমণি সকালবেলা এসে ঝাঁটপাট দেয়। তারপরে হল বা বঁটি পেতে পাকা তেঁতুল কুটতে বসে। কিম্বা বড়ি দিয়ে আধপাগলি মা'কে কাক তাড়াতে বসিয়ে দিয়ে গেল। ঠাকুর গোপালের সঙ্গে তারা কামারনীর বড় ঝগড়া। করকর করে কোন্দল করে ঠাকুরের সঙ্গে, আর উত্তেজনার মুখে লাঠির ঘা মারে চাতালের উপর। ঠাকুরের কী হয় জানা নেই, কাকে কিন্তু বড়িতে ঠোকর দিতে সাহস পায় না। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় চাঁপাগাছের ডালে ডালে স্বর্ণচাঁপা ফোটে। মিত্তির-পাড়া বাইতিপাড়া জোয়াদ্দারপাড়া থেকেও গিন্নিবান্নি মেয়েবউরা এত দূরে আসে জল নিতে। ঢেউ দিয়ে জলের উপরের ভাসন্ত কুটোকাটা সরিয়ে কলসিতে জল ভরে। ভকভক ভকভক করে অমন তিন-চার কলসি একসঙ্গে ভরা হচ্ছে। চাতালের উপর কলসি বসিয়ে নিজেরা পাশে জুত করে বসল। আর কতক জলে নেমে তখনো গা ধুচ্ছে। ডাল বাঁকিয়ে ধরে চাঁপাফুল পাড়ে কমবয়সি কেউ কেউ। শখের প্রাণ—খোঁপায় ফুল গুঁজে বাহার করবে।

কী রাঁধলে দিদি ও-বেলায়?

মোচার ঘণ্ট আর পুঁটিমাছের ঝোল। কী ছাই রাঁধি বল। জিনিসপত্তর আগুন। খাওয়াদাওয়া উঠে গেল এবারে। আটটা প্রাণীর ওই তো একফোঁটা সংসার—তা দু-পয়সার মাছে একটা বেলাও হয় না।

মাছ দেখছ তুমি—এর পর ভাতই তো জুটবে না। পাঁচ টাকা মণের চাল ক-জনে কিনে খাবে?

সুখ-দুঃখের কথাবার্তা এমনি নানান রকম। এপাড়া-ওপাড়ার রকমারি খবরাখবর। আপাতত সকলের বড় খবর, মিত্তিরপাড়ার তড়িৎকান্তি মিত্তিরের ছেলে হীরককান্তির বিয়ে হয়ে গেল খুব জাঁকজমক করে। গাঁয়ের সেরা ছেলে হীরক, কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। স্টেশন থেকে বাজিবাজনা করে বউ বাড়ি এনে তুলল, বউভাত-ফুলশয্যা গিয়েছে কাল।

হতে হতে সেই নতুন বউয়ের কথা উঠল। পূর্ণ জোয়াদ্দারের মেয়ে শেফালী মুখ বেঁকিয়ে বলে, মাগো মা, দেখেছ সে বউ? সাঁড়াগাছের পেত্নী। গাছ থেকে যেন সদ্য নেমে এল।

দক্ষ-পিসি ঘাড় নাড়লেনঃ না রে, এমন-কিছু নিন্দের নয়। চোখ দুটো ছোট, কপালটা ভিটের মতন। কিন্তু গড়নপেটন বেশ ভালই।

শেফালী বলে, কোন চোখ দিয়ে দেখে এলে বল দিকি পিসি?

টুনির্মাণ বলে, দেখলাম তো আমিও। দিব্যি গায়ের রং। দুর্গা-প্রতিমার মতো মুখখানা জ্বলজ্বল করছে।

না হবে কেন? কলকাতার মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে। দামি সাজগোজ করে, গায়ে মুখে নানান রকম সব মাখে। ফুলশয্যার সময় পটের পরী হয়ে বসে ছিল। আবার যখন চান করে উঠবে, দেখে এস তো সেই সময় গিয়ে। পরী আর নেই, দাঁড়কাক হয়ে গেছে।

দক্ষ-পিসি হাসেন। ঘাটের আরও অনেকে হাসে মুখ টিপে। হীরকের উপর শেফালীর রাগ। রাগের ঝাল সে নতুন বউয়ের উপর ঝাড়ছে। হীরক বরাবরই মাতব্বর। বছর কয়েক আগে সেই এক কাণ্ড হয়ে গেল। শেফালী একেবারে ছোট তখন—কী জানি কোন ঝোঁকের বশে প্রেমপত্র লিখেছিল সে গঙ্গেশের নামে। গঙ্গেশও ছেলেমানুষ। চিঠিটা গঙ্গেশের কাছে পেঁছিবার আগেই হীরকের হাতে পড়ে গেল। পাঠচক্র করেছে হীরক—প্রতি রবিবার স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়া হয়। নৈতিক বেচাল তিলেক মাত্র দেখলে সে ক্ষেপে যায়। শেফালীকে যাচ্ছেতাই করে বলল। মেয়েদের সাঁতারের প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, শেফালী তার থেকে বাদ। গ্রামময় চাউর হল ব্যাপারটা। জোয়াদ্দার মশায়ের কানে উঠতে মেয়েকে খুব মারলেন তিনি। সেই রাগ শেফালী আজও পুষে রেখেছে।

টুনির্মাণ বলছে, তা বেছে বেছে চানের পরেই বউ দেখতে যেতে হবে, তার মানেটা কি শিউলি-দিদি? আলগা শ্রী-ছাঁদ আছে, সেই তো ঢের।

শেফালী সেই স্বরের অবিকল অনুকৃতি করে কেটে কেটে বলে, বটেই তো! দুটো হাত আছে, দুটো পা আছে, মাথা আছে, নাক আছে—সেই তো ঢের। শ্বশুর ডাক্তারি পড়ার ষোলআনা খরচা জোগাবে, শ্বশুরবাড়ি থেকে পড়বে।

তড়িৎ-জ্যেঠা হিসাবি মানুষ, জমাখরচ খতিয়ে দেখে তবে বিয়ে দিয়েছেন। ওকি রে—অ্যাঁ ?

উলু, উলু, উলু, উলু—

উলুধ্বনি আসে দূর থেকে। কথাবার্তা থামিয়ে ঘাটের মানুষ কান পেতেছে। কোন্ দিক থেকে আসে? কী হল কার বাড়িতে? পাড়ার কোন বাড়ি কে পোয়াতি, মোটামুটি খবর জানা আছে। উলুটা আসছে কাদের বাড়ি থেকে রে? ক'ঝাঁক উলু, গণে যাও। মেয়ে হলে তিন ঝাঁক. ছেলে হলে সাত কিম্বা নয়। মেয়ে হওয়া দুঃখের ঘটনা, উলু দিয়ে রীতরক্ষা। ছেলের জন্মে আনন্দ।

কিন্তু নয় দশ এগার বার—উলু যে বেড়েই চলল। আ মরণ! দক্ষ-পিসিমা এক গাল হেসে ফেলেনঃ কী তোমরা গোণাগুণি করছ! রাধি পোড়ারমুখী। মনে কিসে পুলক লেগেছে, কলকল করে এপাড়া ওপাড়া উলু দিয়ে বেড়াচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের মেয়ে রাধি—রাধারাণী। দীঘির ওই পশ্চিম পাড়ে বাঁড়ুয্যেপাড়ায় বাড়ি। সর্বক্ষণ রাধির উল্লাস। সময় সময় উল্লাসের বান ডেকে যায়, উলু হয়ে খানিকটা বেরিয়ে পড়ে।

টুনিমণি বলে, গলা ঠিক শানাইয়ের মতো মিঠে। যেন নবমীপুজোর তান ধরেছে।

দক্ষ-পিসি বলেন. দেখতেও লক্ষ্মী-ঠাকরুনটি। বয়সকালে ওর মা-ও ডাকসাইটে রূপসী ছিল। ঠাকুর গোপালের দুয়োর ধরে মেয়ে পেয়েছে। ছেলে চেয়েছিল অনেক করে। ছেলে না দিয়ে ঠাকুর কোল খালি করে নিজের ঠাকরুনটি দিয়ে দিলেন।

ঘোড়া যেমন কদমের চালে লাফ দিতে দিতে ছোটে, উলু দিয়ে তেমনিভাবে রাধারাণী ঘাটে এসে পড়ল। হাঁটনাই এই রকম, রয়ে সয়ে দেখেশুনে হাঁটে না।

জলের কলসি এক ঝাঁকিতে কাঁখে তুলে শেফালী ফরফর করে চলে গেল। আড়চোখে দেখে নিয়ে রাধি বলে, কে যায়—ভালবসা বুঝি?

শেফালীর সেই পুরাণো রাগ রাধির উপরেও। হীরকের পয়লা নম্বর সাগরেদ রাধি—প্রেমপত্র রাধিই চুরি করে হীরককে দিয়েছিল, শেফালীর এই ধারণা। তুমুল ঝগড়াঝাটি সেই নিয়ে। খারাপ মেয়ে বলে রাধি অন্যদের মানা করেছিল শেফালীর সঙ্গে মিশতে। প্রেমপত্রে বানান ভুল করে ভালবসা লিখেছিল, তাই নিয়ে আজও ঠাট্টা-তামাসা চলে—শেফালী নামের বদলে ওরা সব বলে ভালবসা।

দক্ষ-পিসি বলেন, গিয়েছিলি কোথা রাধি?

হাত ঘুরিয়ে রাধি বলে, ওই তো মিত্তিরপাড়ায়। হীরক-দা'র বাড়ি থেকে আসছি। আবার যাব।

মিত্তিরপাড়াটা যেন একেবারে চোখের উপর দেখা যাচ্ছে।

দক্ষ-পিসি বলেন, রাত্তিরবেলা ম্যাচম্যাচ করে একলা অদ্দুর যাস, ভয় করে না? এই বয়স, এই চেহারা তোর—

শ্মশানঘাটের কুলগাছে শাকচুন্নিরা থাকে তো—হীরক-দা'র কাছে বাজি রেখে সেই কুলের ডাল ভেঙে এনেছিলাম শোন নি পিসি?

দক্ষ-পিসি স্নেহস্বরে বলেন, তুইও শাকচুন্নি একটা। মানুষ হলে এমন করে বেড়ায় না। কিন্তু ওনাদের না মানিস, মা-মনসাকে মানবি তো? কাঁচাখেগো দেবতা।

রাধি হেসে বলে, তাই তো শব্দসাড়া করে যাচ্ছি। উলু দিই কি জন্যে? দু-পেয়ে জীবকে সবাই ভয় করে। সাপ হোক বাঘ হোক, দু-পেয়ের সাড়া পেলে ঠিক সরে যাবে।

চাঁপাফুল পাড়ছে রাধি। আগে মাটিতে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করে দেখল। তারপরে হতভাগা মেয়ে করল কি—কোমরে আঁচল বেঁধে বিশাল চাঁপাগাছের মাথায় তরতর করে উঠে পড়ল। ফুল ভেঙে ভেঙে ফেলছে, নেমে এসে কুড়োবে।

টুনিমণি বলে, রাধি-মাসি, আর জন্মে তুমি হনুমান ছিলে।

রাধি বলে, মিত্তিরবাড়ি নতুন বউয়ের সঙ্গে ভাব করে এলাম। খাসা মানুষটা, বড় মিষ্টি কথাবার্তা। চাঁপাফুল পাতাব তার সঙ্গে। দুটো মালা চাই —ওর গলায় আমি একটা দেব, আমার গলায় ও একটা দেবে। ছড়াটা কী যেন পিসিমা?

ফুল পেড়ে নিয়ে রাধি বাড়ি গেল। দুটো মালা গাঁথা শেষ করতে দেরি হল অনেকটা। একটা গলায় পরেছে, আর একটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল।

মিত্তিরপাড়া পথ কম নয়। বাইরের ঘরে হীরক গুলতানি করছিল সমবয়সি ক'জনকে নিয়ে। ওদিকে নয়—হীরক-দা'র সামনে পড়বে না এখন, দেরি হয়ে যাবে। টিপিটিপি রাধি ভিতর-বাড়ি চলল।

চলে গেল নতুন বউয়ের ঘরে। বউয়ের নাম ভক্তিলতা। কালকের অত উৎসবের পর ঘর এখন ঝিমিয়ে আছে। হেরিকেন সামনে নিয়ে ভক্তিলতা চিঠি লিখছে একমনে। পা টিপে টিপে পিছনে গিয়ে রাধি গলার মালা খুলে ঝুপ করে বউয়ের গলায় ছুঁড়ে দিল।

কলকাতার মেয়ে আচমকা ভয় পেয়ে আঁতকে উঠল। রাধি খিলখিল করে হাসে। হেসে হেসে চাঁপাফুল পাতানোর ছড়া বলেঃ সাক্ষি লতা সাক্ষি পাতা

সাক্ষি পাখপাখালি, আজ হইতে তুই আমার চাঁপাফুল হলি। এবারে এই মালাটা তুই আমার গলায় দে, গলায় পরিয়ে দিয়ে ছড়াটা বল্—

কতকাল আগের কথা। সেই দীঘি। চাঁপাগাছটাও খাড়া আছে, বাড়বাড়ন্ত নেই। একটা ফুল ফোটে না। দীঘির পশ্চিম পাড়ে মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের ভিটার উপর রাধি আজ মারা গেল। মড়া গাঙে ফেলে দিতে গেছে, তবু উঠোনে কালকাসুন্দের ঘন জঙ্গলে পাতিশিয়াল খ্যা-খ্যা করে কামড়াকামড়ি লাগিয়েছে।

গোড়া থেকে বলি তবে শুনুন।

= দুই =

রাধারাণীর বাপ মৃত্যুঞ্জয় গাঁয়ে এসে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন অনেকদিন। জয়ঢাকের মতন উদর। পাড়ার লোকে বলে, বিস্তর পয়সা খরচ করে ওই ঢাকখানা বানানো। পোস্টমাস্টার ছিলেন দীর্ঘকাল, নানান জায়গায় বদলি হয়ে বিস্তর ঘাটের জল খেয়েছেন। মৃত্যুঞ্জয় তাতে খুশিই ছিলেন। যত বেশি জায়গায় বদলি করত, তত খুশি। শুধুমাত্র জল খাওয়া নয়, রকমারি খাদ্য খাওয়া যেত। সেই তল্লাটের মিষ্টিমিঠাই মাছ-মাংস দুধ-ঘি তরিতরকারি যত কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু—সমস্ত সংগ্রহ করে বাসায় আনতেন। সরকারি কাজটা রুজি-রোজগারের; আসল কাজ হল ওই সমস্ত। গাঁয়ের লোক দুখানা খাম-পোস্টকার্ড কিনতে এসেছে, তাকেও বসিয়ে খবরাখবর নিতেন কার বাড়ি কী ভাল জিনিস পাওয়া যাবে। হাটবারের দিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে হাটে গিয়ে চেপে বসতেন। জেলে-নিকারিরা অল্প দিনেই চিনে ফেলত তাঁকে। একটা ভাল মাছ এসেছে, খদ্দেরে ঝুঁকে পড়ে দর জিজ্ঞাসা করছে—তারা জবাবই দিতে চায় নাঃ এ জিনিস টেপাটেপি করে কেনা যায় না মশায়। পোস্টমাস্টার বাবুর জন্য এনেছি। আসুন তিনি, দেখতে পাবে। ঠিক তাই। মৃত্যুঞ্জয় এসেই বিনাবাক্যে মাছটার কানকো ধরে খালুইতে তুলে নিলেন। দরের কথা পরে। নিত্যদিনের খদ্দের—দরও কেউ বেশি নেয় না তাঁর কাছে।

যত বয়স হচ্ছে এবং মাইনে বাড়ছে, খাদ্যের বোঝা ততই বেশি বেশি চাপছে। যাবতীয় স্বাস্থ্য শেষটা উদরে গিয়ে ভর করল। অচল হয়ে পড়ছেন দিনকে-দিন। পেন্সন ছেড়ে থোক টাকা নিয়ে তখন কাপাসদা'র পৈতৃক-বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। কাজকর্ম কিছুই পেরে ওঠেন না, একটি ক্ষেত্রে শুধু ক্ষমতা ষোলআনা বজায় আছে—খাওয়া। শুয়ে শুয়েও যা টানেন, দু-তিন মরদে লজ্জা পেয়ে যাবে।

দীর্ঘকাল এ হেন স্বামীর পরিচর্যা করে মনোরমারও ভাল খাওয়ার অভ্যাস। সর্বক্ষণ রান্নাঘরে পড়ে থাকেন। রাধি ছাড়া আরও তিনটে মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু এমন খাদ্যসুখের ঘরে জন্ম নিয়েও পোড়া অদৃষ্টে বেঁচে থাকতে পারল না। চার সন্তানের আহারের দায় অতএব একলা রাধির উপর বর্তেছে। পরিমাণে সে বেশি খায় না, কিন্তু বারম্বার এবং বহু রকম খেতে হয় তাকে। খায় আর নেচেকুঁদে বেড়ায়। আদুরে মেয়েকে কেউ কিছু বলেন না। স্বাস্থ্য আর রূপ তাই এমনধারা। রূপ কেবল গায়ের রঙে নয়—হাতের নখ, এমন কি মাথার চুলও যেন রূপে রূপে ঝিলমিল করে।

কিন্তু এবারে মৃত্যুঞ্জয় আহার ও প্লীহার মায়া কাটাচ্ছেন। তাতে আর সংশয় নেই। জল-বার্লি ছাড়া কিছু পেটে তলায় না—একগুণ খেলেন তো তিনগুণ বেরিয়ে এল। খাওয়ার জন্যে জীবন-ধারণ, সেই খাওয়ার শক্তি গেল তো জীবনের আর মূল্য কী রইল? মরা-বাঁচার ব্যবস্থায় মৃত্যুঞ্জয়ের যদি হাত থাকত, নিজের ইচ্ছাতেই তিনি সরে যেতে চাইতেন—ডাক্তার-কবিরাজের এই ছেঁড়াছেঁড়ি হতে দিতেন না।

খবর পেয়ে মনোরমার বড় ভাই হারাণ মজুমদার এসে পড়লেন। তিলডাঙায় বাড়ি, রেলে যেতে হয়। পাটোয়ারি মানুষ—পেশা বিষয়কর্ম, অর্থাৎ এর পিছনের আঠা ওর পিছনে লাগিয়ে কলে কৌশলে দুটো পয়সা বের করে নেওয়া। হয়ে থাকে ভালই। পৈতৃক যা পেয়েছিলেন, বাড়িয়ে গুছিয়ে তার দশগুণ করেছেন। তিন কুঠুরি দালানও দিয়েছেন সম্প্রতি।

চুপি চুপি হারাণ বোনকে প্রশ্ন করেন, রেখে যাচ্ছে কী রকম?

সে তো জানি নে। বুঝিও নে কিছু। তুমি এসেছ, দেখ এইবারে সমস্ত।

রোগি মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পর্কে দেখবার আর কিছু নেই। সামনের একাদশী অবধি টিঁকে যান তো ঢের। মনোরমা আলমারির চাবি দিয়ে দিলেন, যাবতীয় কাগজপত্র বের করে হারাণ খতিয়ে দেখছেন। অল্পস্বল্প জমাজমি—রিটায়ার করবার পর তারই উৎপন্ন ছিল ভরসা। জমির ধান এনে এনে খেয়েছেন, কিন্তু খাজনার বাবদে পাইপয়সাও ঠেকান নি মৃত্যুঞ্জয়। ডিক্রি হয়ে আছে কতক, নিলাম হয়ে গেছে বেশির ভাগ জমি।

শুধুই খেয়েছেন দেখছি বাঁড়ুয্যে মশায়। মাছ-শাক কেবল নয়—বিষয়আশয় সমস্ত। বাস্তুভিটে দু-দশটা গাছগাছালি আর দেড় বিঘে ধানজমি—এই তোদের সম্বল। পেনসনও বিক্রি করে পেটে দিয়েছেন। ক'খানা কাগজ কিনেছিলেন তোর নামে—তাই কেবল খেতে পারেন নি।

মনোরমা বলেন, তা-ও খেয়েছেন। সবগুলো পেরে ওঠেন নি। চিরকালের খাইয়ে মানুষ—খেতে চাইলে আমি না বলতে পারতাম না। কাগজ এক একখানা করে বের করে দিয়েছি। ওই ক'খানা রয়ে গেছে খাওয়ার এখন আর জো নেই বলে। হয়তো রাধির কপালে—তার বিয়ের খরচখরচা। ঠাকুর গোপাল সদয় হয়ে ও ক'টা টাকা থাকতে দিলেন।

রাধারাণী কাছাকাছি ঘুরছিল। সেইদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হারাণ ঘাড় নাড়লেনঃ না, মেয়ের বিয়েয় তোর এক পয়সাও লাগবে না মনো। লুফে নেবে। বলিস তো উল্টে কিছু উশুল করেও আনতে পারব বরের ঘর থেকে।

মনোরমা বলেন, সে তো পরের কথা। এখনকার কি ব্যবস্থা—খাই কি, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে থাকি কোথায়—সেই ভাবনা ভাব এইবার দাদা। অবস্থা চোখের উপরেই তো দেখতে পাচ্ছ।

যা হবার তাই ঘটল। মৃত্যুঞ্জয় মারা গেলেন। যে কষ্টটা পাচ্ছিলেন—কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দিনরাত্রি চোখের কোণে জল গড়াত—মরে যেন বেঁচে গেলেন তিনি।

ক'দিন পরে ভাই-বোনে আবার সেই প্রসঙ্গ উঠলঃ রূপসী মেয়ে বলছ দাদা, আমার বুক কাঁপে। মেয়ের গায়ে যে রূপের জ্বলুনি! দিনকে দিন দাউদাউ করে উঠছে। দালান-কোঠার মধ্যে পাইক-দরোয়ানের পাহারায় রেখেও লোকের ভয় কাটে না। বিধবা-বেওয়া মানুষ আমি কোন সাহসে একা একা ওকে নিয়ে ভিটের উপর থাকি?

হারাণ লোক খারাপ নন। এসব তিনিও ভাবছেন এই ক'দিন ধরে। বললেন, আমার ওখানে চল তোরা। বোন-ভাগনীকে ফেলে দিতে পারি নে। দালান-কোঠার কথাটা যখন বলালি, দালানের মধ্যেই রাখব। মোহিত বউমাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা করল, তার কুঠুরিতে থাকবি তোরা।

আবার বলেন, আমার কিন্তু হিসাবি সংসার। খাউন্তি-দাউন্তি মানুষ তোরা—তোর খাওয়া তো বিধাতা ঘুচিয়ে দিলেন, কিন্তু রাধি পারবে তো মামার বাড়ির খাওয়া খেয়ে?

এখানে কোন খাওয়াই তো জুটবে না। দেড় বিঘের ধানে ক'মাস চলবে বল। আমরা ছাড়াও তারা কামারনী আর তার মেয়ে। তারা ওঁকে ধর্মবাপ বলেছিল, উনি আশ্রয় দিয়ে গেছেন। চোখ বুজতে বুজতে দূর করে দিতে পারি নে তো! খাওয়ার কথা কী বলছ দাদা, সেসব সেই মানুষটার সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

এমন অবস্থার মধ্যেও হারাণ সগর্বে একবার গোঁফ চুমরে নেনঃ তবেই বোঝ আখের ভেবে কাজ না করার ফল। বাঁড়ুয্যে মশায়ের সম্বন্ধে ভাবতিস, অমন ধনুর্ধর স্বামী হয় না। স্বর্গে পা ঠেকাতে না ঠেকাতে এক্ষুণি আবার উল্টো সুর ধরেছিস। আর আমারও দেখবি। বাড়ির লোকে সর্বক্ষণ খিচখিচ করে, পারলে আমায় দাঁতে ফেলে চিবাত। আমি কঞ্জুষ, না খাইয়ে রাখি আমি সকলকে, ছেলে-বউ না-খাওয়ার দুঃখে কলকাতা পালাল। কিন্তু বলে রাখছি, আমি যখন চোখ বুজব, ওই ছেলে-মেয়েরা স্ফূর্তিতে বগল বাজাবেঃ এমনধারা বাপ হয় না—পেটে না খেয়ে পুঁটিমাছের পোঁটা গেলে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে রেখে গেছে।

= তিন =

হারাণ মজুমদারের স্ত্রী শান্তিবালাও ভাল। গরুর গাড়ি দক্ষিণের ঘরের পৈঠার নিচে এসে থামল। গাড়োয়ান গরু দুটো খুলে বেড়ার জিওলগাছের সঙ্গে বেঁধেছে। সকলের আগে হারাণ গাড়ি থেকে নামলেন। রান্নাঘরে হলুদ বাটতে বাটতে শান্তিবালা তাকাচ্ছেন ঘাড় বাঁকিয়ে।

হারাণ বলেন, কাপাসদা থেকে চুকিয়ে বুকিয়ে এল।

হলুদের হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে শান্তিবালা উঠানে এলেন। রাধি প্রণাম করতে যায়।

একি রে! অশৌচের মধ্যে প্রণাম করে নাকি?

জড়িয়ে ধরলেন তাকে। কোলের ভিতর নিয়ে চেঁচামেচি করছেনঃ মেয়েরা গেলি কোথা? চলে আয়, সোনার প্রতিমা কাকে বলে, দেখে যা চক্ষু মেলে।

চার মেয়ে, আরতি বড়। আর ছেলে মোহিত কলকাতায় চাকরি করে, বউ নিয়ে বাসা করেছে। দালানের ভিতর চার বোনে লুডো খেলছিল না কি করছিল, হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে।

শান্তিবালা বললেন, দিদি হয় তোদের। আরতি, তোর নয়। রাধির তুই দেড় বছরের বড়।

নতুন জায়গায় চেনাজানা করতে রাধির এক মিনিটও লাগে না। বাপের সঙ্গে বাসায় বাসায় ঘুরেছে, আর স্বভাবটাই তার এই রকম। হেসে উঠে সে বলে, এ কেমন হল মামিমা? অশৌচ বলে আমায় প্রণাম করতে দিলেন না, আমার পায়ে বোনেরা কেন এসে পড়ে?

শান্তিবালা বলেন, তবে আসল কথা বলি রে বেটি। অশৌচ একটা ছুতো। লক্ষ্মীঠাকরুন কার পায়ে মাথা ঠেকাবেন রে? তাঁকেই সব গড় করবে। স্বয়ং কমলা তুই কন্যে হয়ে এসেছিস। উঠোন আলো হয়ে গেল।

রাধির একটা হাত তুলে চোখের সামনে এনে ধরেন। হাত [illegible] মুখখানা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেন। বলেন, হস্তেলে [illegible] রং। চোখ-মুখ-নাক যেভাবে যেমনটি হলে মানায়। বিধাতাপুরুষ [illegible] ধরে গড়েছেন। তুই আর পাশে দাঁড়াস নে আরতি, বড় উৎকট দেখাচ্ছে।

অগ্নিদৃষ্টি হেনে আরতি সাঁ করে চলে গেল। শান্তিবালার হুঁশ [illegible] তখন। মেয়ে আর ছোটটি নয়, সামনের উপর এমন কথা বলা অনুচিত

যত রাগ গিয়ে পড়ে তখন স্বামীর উপরঃ যক্ষি হয়ে ধনসম্পত্তি আগলাও, এই পয়সা খরচ করতে বুকের একটা পাঁজরা ছিঁড়ে যায়। চেহারা হবে কিসে মেয়ের? লাউ-কুমড়োর মাচায় একটা-দুটো বীজ রেখে দেয় না—মেয়ের

কপালেও তেমনি হবে দেখো। বিয়ে দিতে হবে না, চিরজীবন ঘরে রেখে পুষবে।

হারাণ হুঁকো-কলকে নিয়ে তামাক সাজছিলেন। মুখ তুলে সদম্ভে বলেন, হয় কি না দেখো। চেহারায় কিছু খামতি থাকে তো পণ দিয়ে তার পূরণ হবে। একটা সম্বন্ধ নাকচ হচ্ছে, আর পণের টাকা দু-শ করে বাড়িয়ে যাচ্ছি। বার-শ অবধি উঠেছে, দেখা যাক কদ্দুর গিয়ে লাগে।

কলকেয় আগুন দিতে দ্রুত রান্নাঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন।

শান্তিবালা শুধু বাড়ির মধ্যেই নিরস্ত হচ্ছেন না, পাড়ায় গিয়ে হাঁকডাক করবেন। মুশকিল হয়েছে, রাঁধাবাড়ার সময় এখন, তারপরে আবার খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা। কায়ক্লেশে দুপুরটা না কাটিয়ে উপায় নেই।

দুপুর না গড়াতেই উঠে পড়লেন। পূবের কোঠায় ঢুকে রাধিকে বলেন, চল্—

রাধারাণী চক্ষের পলকে অমনি উঠে দাঁড়ায়।

শান্তিবালা হেসে বলেন, মর মুখপুড়ি। কাপড়চোপড় পরবি, সাজগোজ করবি তো একটু।

মনোরমা প্রশ্ন করেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বউ?

এ-পাড়ায়, ও-পাড়ায়। সময় হয়তো খালপারেও একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসব।

মনোরমা বলেন, কপালে জয়পত্তর লিখে সেকালে অশ্বমেধের ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। তোমার যে দেখি সেই বৃত্তান্ত। বউ তুমি পাগল।

শান্তিবালা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, ইন্দু বলে একটা মেয়ে আছে, তাকে নিয়ে বড় গরব। আরতিকে একদিন কুচ্ছো করেছিল ইন্দুর মা। এবারে দেখিয়ে আসি, সেই ইন্দু আমার রাধারাণীর পা ধোয়ানোর যুগ্যি নয়।

তা বলে সোমত্ত মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে বেড়ানো কি ভাল? হারামজাদি মেয়ে তো লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে, তুড়ুক-সওয়ার—বললেই অমনি উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার মুখ ছোট হয়ে যাবে না?

তাই বটে! উৎসাহ ঝিমিয়ে আসে শান্তিবালার। থমকে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল ভেবে বললেন, রাধারাণী, তুমি বাড়ি থাক মা। সেজেগুজে একটা চেয়ারের উপর রাণী হয়ে বসে থাক। যাদের ইচ্ছে হবে, বাড়ি এসে দেখবে। পাড়ায় কী জন্যে যেতে যাবে তুমি?

মাথায় সত্যিই ছিট আছে শান্তিবালার। একপাক ঘুরে বাড়ি ফিরে এলেন। কী সব রটনা করে এসেছেন—তারপরে দেখা যায়, গিন্নিবান্নিরা আসছেন দু-একজন করে। গিন্নিরা ফিরে গিয়ে বলছেন তো বউ-মেয়েরা আসছে। পুরুষও কয়েকজন একটা কোন দরকার মুখে নিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেলেন।

শান্তিবালা বসতে বলছেন তাঁদের, আসন দিচ্ছেন, পান দিচ্ছেন, জল দিচ্ছেন। তারই মধ্যে সগর্বে একবার বা তাকিয়ে নিলেন মনোরমার দিকে।

নিরিবিলি পেয়ে এক সময় মনোরমা বলেন, রূপ নিয়ে জাঁক করছ বউ, এসব কিন্তু ভাল নয়। আমার গা কাঁপে।

শান্তিবালা বলেন, রূপ হল ভগবানের দান। ক'জনে পায়? পেয়েছে যখন কেন জাঁক করব না। হাঁকডাক করে সকলকে দেখিয়ে বেড়াব ঠাকুরঝি।

মাসখানেক পরে আরতিকে দেখতে এসেছে একদল। পাঁচজন তাঁরা, সবাই প্রবীণ। সম্বন্ধটা সত্যি ভাল—এক বছরের উপর চিঠি লেখালেখি হচ্ছে। হারাণ নিজে বার দুয়েক গিয়ে খোশামুদি করে এসেছেন। নিয়মদস্তুর গয়নাগাঁটি ও বরসজ্জা ছাড়াও নগদ বরপণ বার-শ' টাকা! তা সত্ত্বেও পাত্রপক্ষ গা করেন না। মেজাজ হারিয়ে হারাণ তখন এক সঙ্গে তিন-শ' তুলে পণ পুরোপুরি দেড় হাজার হেঁকে দিলেন। তারপরেই এসেছেন এঁরা। আদর-আপ্যায়ন যথোচিত গুরুতর হয়েছে, জলখাবার খেয়েই কুটুম্বরা বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। আসন পেতে মেয়ে এনে বসালে কর্তব্যবুদ্ধির চাপে তখন উঠে বসতে হল।

পাত্রের বাপ স্বয়ং আরতিকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, আর একটা মেয়ে দেখলাম মজুমদার মশায়। আমাদের জলখাবার দিচ্ছিল।

আমার ভাগনী।

সে মেয়েও দিব্যি বিয়ের মতন হয়েছে। স্বাস্থ্যশ্রীর দিক দিয়ে তার বিয়েই বরঞ্চ আগে হওয়া উচিত।

হারাণ হাত ঘুরিয়ে বলেন, হলে হবে কি! ভাঁড়ে মা ভবানী। বাপ মরবার সময় শুধু ওই মেয়ে রেখে গেছেন। আর গোটা দশেক খাজনার ডিক্রি।

পাত্রের বাপ বললেন, খাসা মেয়েটা। সোনার প্রতিমা।

হারাণ বিরক্ত স্বরে বললেন, আমার মেয়ে আরতিকে কেমন দেখলেন তাই বলুন।

শুধু চোখের দেখায় তো হবে না। কুষ্ঠিটা দিয়ে দিন। মিলিয়ে দেখা হবে। তারপরে খবর দেব।

কুষ্ঠি নেই।

তাহলে জন্মপত্রিকা--কোন তারিখে কোন সময় জন্মেছে, সেইটে পেলেই হবে।

হারাণ সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেন, মেয়ে পছন্দ হয় নি তবে?

সে কী কথা! পছন্দ হলেও তো কুষ্ঠি চাই। মেয়ের বিয়ে দেবেন অথচ কুষ্ঠি নেই—পাকা লোক হয়ে এটা কি রকম হল মজুমদার মশায়?

সেইজন্যেই তো ওদিকে গেলাম না। যারা বোঝে না, তারাই গণককে গচ্চা দিয়ে মরে। বিয়ের মেয়ের কুষ্ঠি লোকে আটঘাট বেঁধেই করে। কুষ্ঠি থাকলে দেখতে পেতেন, রাজরাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া আর আরতি হুবহু এক লগ্নে জন্মেছে। তবু কিন্তু মিল হত না। তার চেয়ে সোজাসুজি বলে দিন দোষটা কি দেখলেন আমার মেয়ের।

ভদ্রলোক ডিবে থেকে দুটো পানের খিলি মুখে পুরে নীরবে চিবাতে লাগলেন। আরতি উঠে গেল ভিতরে। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, স্পষ্টই বলি তবে। মেয়ের রং কাল। গোড়াতেই বলেছি, কাল মেয়ে হলে চলবে না।

হারাণ বলেন, কোন চোখ দিয়ে দেখলেন বলুন তো। আমার মেয়ে কাল বলেন তো ফর্সা মেয়ে বাংলামুলুকে পাবেন না। বিলেত থেকে জাহাজে বয়ে আনতে হবে।

ভদ্রলোক বলেন, কেন, ওই যে ভাগনী আপনার। ফর্সা ওকেই বলে।

অমন লাখে একটা। রফা করে হারাণ বলেন, বেশ, ভাগনীকেই তবে নিয়ে নিন। সে-ও আমার দায়। হলে বুঝব, আপনার পিছনে বছর ভোর ঘোরাঘুরি মিছে হয় নি।

বেশ তো! বলে ভদ্রলোক পায়ের উপর পা তুলে আঁটোসাটো হয়ে বসলেনঃ আপনার ভগ্নিপতি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। সেই বিবেচনায় চার-শ' পাঁচ-শ' কম করে নেওয়া যাবে। কি বল হে?

বলে সমর্থনের জন্য পাশের পারিষদটির দিকে তাকালেন।

হারাণ মজুমদার ঘাড় নাড়ছেনঃ উঁহু, শুধুমাত্র শাঁখা-শাড়ি। সেই শাঁখা আর শাড়ির খরচটা মশায় বহন করলে ভাল হয়। পুরুতের দক্ষিণাও মশায়ের। যে ক'জন বরযাত্রী আসবে, হিসেবপত্তর করে তাদের খোরাকি সংগে আনবেন। সোনার প্রতিমা ঘরে নিয়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়।

অধিক কথা না বাড়িয়ে পাত্রপক্ষ এর পর উঠে পড়লেন।

আরতি সেই গিয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে বিছানার উপর। ভাল কাপড়-চোপড় পরে গয়নাগাটি গায়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় অমনি পড়েছে। কেউ কিছু বলতে গেলে ঝেঁকে ওঠে। উপুড় হয়ে পড়ে ছিল, শান্তিবালা জোর করে তুলতে গিয়ে দেখেন মেয়ের চোখে জল। চোখের জল দেখে মায়ের প্রাণে মোচড় দিয়ে উঠল।

রোগা বলুক আরতিকে, নাক থ্যাবড়া বলুক, শতেক কুচ্ছো করুক। কিন্তু কাল বলে ওরা কোন বিবেচনায়?

মেয়ে দেখানো ব্যাপারটাও পাড়াগাঁয়ে পরব। গিন্নিবান্নি ও বউমেয়ে কয়েকজন এসেছেন। একজনে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেন, যাই বল মোহিতের মা,

মেয়ের বিয়ে দেওয়া তোমাদের মনোগত ইচ্ছে নয়। তাহলে এই কেলেঙ্কারিটা করতে না।

শান্তিবালা আকাশ থেকে পড়েনঃ আমরা কি করলাম?

রাধারাণীটার হাতে জলখাবার দিয়ে পাঠালে। চোখের উপর রূপ দেখিয়ে ঘুরঘুর করতে লাগল। মুনির মন টলে যায়। বলি, ফর্শার উপরেও তো আরো ফর্শা থাকে। সূর্যি থাকতে তারা নজরে পড়ে না কেন? রাধিকে দেখে তারপরেই তো ওরা কাল বলে মুখ ফেরাল।

প্রথম দিনের সেই তুলনার পর থেকেই আরতি রাধারাণীর দূরে দূরে থাকে। শান্তিবালার এত উচ্ছ্বাস, তিনিও কেমন চুপ হয়ে গেলেন। দেখে শুনে মনোরমা মরমে মরে যান। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছে, আর তাদের সঙ্গে শত্রুতা সাধছেন বিয়ের সম্বন্ধ পণ্ড করে দিয়ে। অত রূপের মেয়ে নিয়ে আসা শত্রুতা ছাড়া আর কিছু নয়। মনে মনে মনোরমার ভয় হচ্ছে। পাড়ার গিন্নিরা যেমন করে বলছেন, শেষটা একদিন এরা পথে বের করে না দেয়। কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? একলা হলে দায় ছিল না, পেটের শত্রু রয়েছে—সর্ব অঙ্গে যার পাগল-করা রূপ। যার কথায় হারাণ বলেন, লাখের মধ্যে একটি।

মনোরমা বলেন, মেয়ের গতি করে দাও দাদা। নয়তো মাথা খুঁড়ে মরব। কত ভরসা দিয়েছিলে তুমি, মেয়ে নাকি লুফে নেবে। কোথায়?

হারাণ বলেন, এখনো বলছি তাই। তোর মেয়ে পড়তে পাবে না। কিন্তু সময় দিবি তো খুঁজে পেতে আনতে? আরতিটার জন্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরছি। বচন ছেড়ে ছেড়ে তোর ভাজ আমায় পাগল করে তুলছে। এটা চুকিয়ে দিয়ে তারপরে দেখিস কী সম্বন্ধ নিয়ে আসি রাধির জন্যে!

= চার =

আবার দেখতে আসছে আরতিকে। পাত্র নিজে আসছে, সঙ্গে মহকুমা শহরের উকিল মুরারি হালদার। মুরারি উকিলের মক্কেল হলেন হারাণ, মুরারির সেরেস্তায় তাঁর যাবতীয় কাজকর্ম। সেই সূত্রে খাতির-ভালবাসা। হারাণ কতবার রাত্রিবাসও করেছেন উকিলবাবুর বাড়ি। পাত্র ম্যাট্রিক পাশ, দূরসম্পর্কের আত্মীয়তা আছে মুরারির সঙ্গে। পুরোপুরি না হলেও খানিকটা মুহুরিও বটে। দিনকে দিন পশার বাড়ছে মুরারির। পুরানো পাকা মুহুরি সুরেন বক্সী একলা সব পেরে ওঠেন না, এই ছোকরা সাথেসঙ্গে থাকে। মুরারিই একবার তুলেছিল এই সম্বন্ধটা। কন্যাদায়ে হারাণ বিব্রত হয়ে বেড়াচ্ছেন,—তাই শুনে মুরারি বলল, আমাদের নবকান্তর সঙ্গে রাজি থাকেন তো বলুন। সংক্ষেপে হয়ে যাবে। আমি বললে ওর বাপ কক্ষণো দর-কষাকষি করতে যাবে না। হারাণের চার মেয়ে শহরে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিল, নবকান্ত সেই সময় একনজর দেখেও ছিল আরতিকে। তিন চার বছর আগেকার কথা, আরতি তখন এত ডাগর হয় নি। পাত্র অপছন্দ করে নি—কিন্তু নিতান্তই উকিলের মুহুরি বলে হারাণ গা করলেন না। মোক্তারি পরীক্ষা দেবে সেই নবকান্ত আসছে বছরে। মুহুরিগিরি ছেড়ে মোক্তার হয়ে সে কাছারি বেরুবে। মুরারি হালদার বলেছে, মক্কেল জুটিয়ে পশার করে দেওয়ার দায়িত্ব তার। এটা উকিলবাবু স্বচ্ছন্দেই পারবে। কথা দিয়েছে হারাণের কাছে। মুখে যতই আস্ফালন করুন, চার মেয়ের বাপ হারাণ একজনের বিয়েয় সর্বস্ব ব্যয় করে ফতুর হতে পারেন না। পুরানো প্রস্তাব অতএব খুঁচিয়ে তুলেছেন আবার। মহরম উপলক্ষে কাছারি দু-দিন বন্ধ। অভিভাবক স্বরূপ মুরারি নিজে পাত্রকে নিয়ে আসছে। এটা একেবারে অভাবিত। নিত্যদিন আদালতে ছুটোছুটি, ছুটি পেয়ে ঘরে শুয়ে দুটো দিন বিছানায় গড়িয়ে নেবে—তা নয়, কোন পাড়াগাঁয়ে চলল মুহুরির জন্য পাত্রী পছন্দ করতে। রওনা হয়ে না বেরুন পর্যন্ত নবকান্তও বিশ্বাস করতে পারে নি। মুরারি বলে, ওকালতি পাশ করে প্রথম এসে বসলাম—মজুমদার মশায় আমার সেই আমলের মক্কেল। নবকান্তও অতি আপন জন। দেখা যাক, নিজে উপস্থিত থেকে যদি যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। মেয়ে চলনসই হলে একেবারে পাকা কথা দিয়ে আসব।

খোদ মুরারি হালদার চলে আসছে—সমারোহ পড়ে গেল হারাণের বাড়ি। কাজকর্মের মধ্যে শান্তিবালা এক সময় কঠিন মুখে রাধিকে বললেন, 'তোমায় মানা করে দিচ্ছি বাছা। ফরফর করে কুটুম্বর সামনে অমন যেও না।

সেবারে শান্তিবালাই কিন্তু বলেছিলেন রাধিকে জলখাবার দিয়ে আসতে। সে কথা বলতে গেলে কলহ বেধে যায়। মেয়ের দোষ মেনে নিয়ে মনোরমা তাড়াতাড়ি বলেন, হতচ্ছাড়ির একটু যদি লাজলজ্জা থাকে! ভেব না বউ, সেদিন আমি তালা-চাবি দিয়ে আটক করে রাখব।

সত্যি, বিশ্বাস নেই রাধিকে। আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়. বাপ আদর দিয়ে মাথাটি খেয়ে রেখে গেছেন। নীতি-উপদেশ বড় একটা কানে নেয় না। এত কথা-কথান্তরের পরেও কুটুম্বদের সামনে গিয়ে উঠতে না পারে এমন নয়। ঠিক তালা-চাবি না দিন, মনোরমা কড়া নজরে রেখেছেন মেয়েকে। কুঠুরির বাইরে না যায়। আরতিকে দেখে কথাবার্তা শেষ করে কুটুম্বরা বিদায় হয়ে গেলে তবে সে বেরুবে।

মুরারি উকিল বলে, মেয়ে তো খাসা। আহা-মরি না হল, গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের যেমনটি হওয়া উচিত। এদিককার সব হয়ে গেল মজুমদার মশায়, বাকি এখন লেনদেনের কথাটা। তা-ও সেরে যেতে পারি, সে জোর আছে ওদের উপর। কিন্তু নবকান্তর বাপ উপস্থিত থেকে মীমাংসা করবেন, সেইটে ভাল হয়। আমি যখন মধ্যবর্তী আছি, কোন অসুবিধা হবে না।

আরতিকে বলে, তুমি মা বসে বসে ঘামছ কেন? চলে যাও, দেখা হয়ে গেছে।

আরতি উঠে গেল। তারপরে একথা সেকথা। মক্কেলের বাড়ি উকিল এসে পড়েছে—অতএব মামলা-মোকর্দমার কথা উঠে পড়ল। ছোট্ট একটা নালা নিয়ে এই গাঁয়ের দু-ঘর নিকারি ফৌজদারি দেওয়ানি উভয় রকম মামলা করে মরছে। হারাণ এক পক্ষের মুরুব্বি, অতএব মুরারি হালদারকে ওকালতনামা দিয়েছে তারা। মুরারি বলে, এসেছি যখন সেই নালাটা একবার চোখে দেখব। গরিব মানুষ জলের মতন পয়সা খরচ করছে—দেখে যাব, কত জল আছে ওইটুকু নালায়, কত মাছ আছে জলটুকুর নিচে।

বলতে বলতে আর একটা কথা হঠাৎ বুঝি মনে পড়ে যায়ঃ মজুমদার মশায়, আরও একটি মেয়ে আছে তো আপনার বাড়ি।

হারাণ বলেন, একটি নয়—তিন তিনটে। তবে আর বলি কেন। তারা ছোট, তাদের ভাবনা পরে। প্রজাপতির দয়ায় আরতির বিয়েটা হয়ে যাক নির্বিঘ্নে—

আপনার নিজের মেয়ের কথা হচ্ছে না। ভাগনী এসে পড়েছে, সে দায়ও তো আপনার। আসা গেছে যখন, তাকে এক নজর দেখে যাব। কী বল?

নবকান্তর দিকে তাকালেন মুরারি। উৎসাহ ভরে নবকান্ত সায় দিলঃ হ্যাঁ ছোড়দা—

মনে মনে প্রমাদ গণে হারাণ বলেন, শুনলেন কার কাছে?

মুরারি উকিল হেসে বলে, তিলডাঙায় মক্কেল আপনি একা নন। বলে দিল, কনে দেখতে যাচ্ছেন তো সে মেয়েটাও দেখে আসবেন।

অনেক খবরই তবে জেনে এসেছে। তিরিশ টাকা ফী কবুল করে সেবার একটা কেসে মুরারি উকিলকে জেলা-কোর্টে নিয়ে যেতে পারে নি, মক্কেলের পঙ্গপাল ঠেলে অন্য কোথাও যেতে সে নারাজ। সেই মানুষ হুট করে জঙ্গুলে পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ল, নিশ্চয় রাধারাণীর রূপের কথা কানে গিয়েছে। রূপ দেখবার কৌতূহলে এসেছে। রাধির রূপের খবর তবে তো এ-গ্রাম ও-গ্রাম নয়, অতদূরের শহর অবধি পেঁাছে গেছে! এতক্ষণে হারাণের সেটা মালুম হল। দরজার ভিতরে ঢুকে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসে বলেন, অসুখ করেছে রাধির। শুয়ে আছে।

কী অসুখ?

এত বড় পাটোয়ারি মানুষ হয়েও হারাণের জিভের ডগায় কোন একটা শক্ত অসুখের নাম এল না। বলে ফেললেন, জ্বর—

মুরারি শশব্যস্তে বলে, তবে আর উঠে এসে কাজ নেই। আমরা গিয়ে এক নজর দেখে আসি। মানে, বড্ড সুখ্যাতি কিনা আপনার ভাগনীর, সবাই বলে দেখে আসবেন। সাপ না ব্যাং—দেখে যাই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে।

আচ্ছা, বসুন। আসছি আমি—

পুনশ্চ ঘুরে এসে হারাণ বললেন, বসুন আপনারা। রাধিই আসছে। আপনারা কষ্ট করে যাবেন, সে হয় না।

বলছে অত করে, বের করতেই হবে রাধিকে। না দেখিয়ে উপায় নেই, উকিল মুরারিকে কোনক্রমে চটান চলবে না। শান্তিবালা অতএব পূবের দালানের দোরগোড়ায় গিয়ে ডাকলেনঃ যেতে হবে একবার। ডাকছে।

রাধি কাপড়ের উপরে উল দিয়ে রাধাকৃষ্ণ তুলছিল। বুনানি ফেলে উঠে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছিল যেন এমনি একটা-কিছুর।

শান্তিবালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, ছুঁড়ি একপায়ে খাড়া। তুমি ঠাকুরঝি দিব্যি তো বসে বসে দেখছ। বলি, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরেই কী যাবে? চাকরানি ভাববে এ-বাড়ির।

মনোরমা বলেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বউ?

ডেকে পাঠিয়েছে। চোখে একবার না দেখে ওরা নড়বে না। আমরা চেপে রাখলে কি হবে, চারিদিক জুড়ে ঢাকের বাদ্যি।

মনোরমা বলেন, কারো সামনে যাবে না আমার মেয়ে।

মেয়ের উপর তাড়া দিয়ে ওঠেনঃ যা করছিলি কর বসে বসে।

শান্তিবালা ক্ষেপে গেলেনঃ উকিলবাবুর অপমান করা হবে। আরতিকে এক রকম পছন্দ করেছেন—সম্বন্ধ ভেঙে দিয়ে চলে যাবেন। জমাজমির গোলমাল বাধলে উকিলবাবুর কাছে ছুটতে হয়, ভাতভিত্তি সমস্ত ও'র সেরেস্তায় বাঁধা। শত্রুতা করে যদি সব লণ্ডভণ্ড করতে চাও, হোক তাই ঠাকুরঝি।

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে কাতর হয়ে যানঃ এত সব আমি জানতাম না বউ। রাধি তোমারও মেয়ে, যেখানে খুশি নিয়ে যাও। কিন্তু যাবে তো এই কাপড়েই যাক। চাকরানি ভেবে ও'রা মুখ ফিরিয়ে থাকুন। সেবারের ওই কাণ্ডের পর আমি যে মুখ দেখাতে পারি নে তোমাদের কাছে।

বলতে বলতে কে'দে ফেললেনঃ ময়লা কাপড় কী বলছ! কিছু মনে না কর তো হাঁড়ির তলার কালিঝুলি খানিকটা এনে ওর মুখে মাখিয়ে দিই। মেয়ে নিয়ে আমার ভয় ঘোচে না, কী করব ভেবে পাই নে।

রাধারাণী সহজভাবে বলে, সেবারে গিয়ে তো খাবার পরিবেশন করলাম। আজ গিয়ে কি করতে হবে, বলে দাও মামিমা।

কিছু করবি নে। ঢিবঢিব করে দুটো প্রণাম সেরে চলে আসবি।

ঘাড় বাঁকিয়ে রাধি বলে, সে আমি পারব না। কোন গুরুঠাকুররা এসে বসলেন যে প্রণাম করতে হবে!

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, না, কিছু করবি নে তুই। বেশি কাছেও যাবি নে। কোন রকমে দায় সেরে বেরিয়ে আসবি। ভাববে, মেয়েটা ভব্যতা জানে না। তার জন্য বেজার হয় তো ভালই।

আবার এসে হারাণ ভাগনীকে নিয়ে চললেন। সভয়ে নজর রাখছেন। কিন্তু যা ভেবেছেন, তাই। তার চেয়েও বেশি। যেই মাত্র রাধারাণী গিয়ে দাঁড়াল উকিল-মুহুরি দু-জনেরই দেবচক্ষু। পাঁঠা বলি হবার পর কাটা-মুণ্ডের উপর স্থির নিমীলিত যে দুটো চোখ, তার নাম দেবচক্ষু। কুটুম্বদের দু-জোড়া চোখের অবিকল সেই অবস্থা।

নবকান্ত ফিসফিস করে বলে, দেখুন ছোড়দা, চেয়ে দেখুন। চোখের উপরেও যেন হাসি মাখানো। মুখের আদলটাই অমনি।

মুরারি স্পষ্টভাষী। বলল, আপনার মেয়ে দেখলাম। আর এই দেখছি। যাই বলুন মজুমদার মশায়, সেই মা-লক্ষ্মীর কেমন যেন গোমড়া মুখ। ঠোঁট ফুলিয়েই আছেন।

নবকান্ত আবার বলে, হাতের তেলোর দিকটা একবার দেখুন। টুকটুক করছে। রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে যেন।

মুরারি রাধারাণীর বাঁ-হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়ঃ কী কোমল! আর সেই মা-লক্ষ্মীর খরখরে হাত। মজুমদার মশায় অবস্থাপন্ন মানুষ। নয়তো বলতাম, মেয়েকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে মাজিয়ে ওই অবস্থা করেছেন।

হস্তরেখা দেখছে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। উকিলবাবুর হয়ে গেল তো মুহুরি তখন ধরে। দেখা গেল, দু-জনেই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী।

মুরারির এক পিশতুত ভাইয়ের সম্বন্ধী হল নবকান্ত। সেই সুবাদে দাদা বলে—ছোড়দা। দেখাশুনো হয়ে যাবার পর একটু নিরিবিলি হয়েছে দু-জনা। সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে একরকম মরীয়া হয়ে নবকান্ত বলে, আগেরটা নয় কিন্তু ছোড়দা। এইটে—এই মেয়ে।

মুরারি খিঁচিয়ে ওঠেঃ একেবারে ন্যাড়া মেয়ে—মেয়ের সঙ্গে লবডঙ্কা। বলি, তোমার বাপকে সামলাবে কি করে? গড়ভাঙার গাঁতি কিনবেন তিনি বরপণের টাকায়, দরদাম করে বসে আছেন।

আমি তার বোঝাপড়া করব।

মুরারি বলে, বাপে ছেলেয় কুরুক্ষেত্তর বেধে যাবে। আমায় নিমিত্তের ভাগী করবে। তা ছাড়া, সম্বন্ধ করতে এসেছি মজুমদার মশায়ের মেয়ের সঙ্গে। কোন মুখে তাঁকে বলি, মেয়ে নয়-- ভাগনীকে পছন্দ। ছ্যাঁচড়া কাজ আমায় দিয়ে হবে না, সাফ কথা বলে দিচ্ছি।

তাড়া খেয়ে নবকান্ত মুখ চুণ করে রইল। যাবার সময় মুরারি হারাণকে বলে, আসছে হপ্তার শেষাশেষি আমার ওখানে চলে আসুন। যা বলবার সেই সময় বলে দেব। আসবেন নিশ্চয়, অবহেলা করবেন না।

চলে গেল ওরা। অনেক কথাই শান্তিবালার কানে গেছে। স্বামীর উপর রে-রে করে উঠলেনঃ মেয়ের বিয়েই যদি দেবে, রূপসী ভাগনীকে বাড়ি এনে তুললে কোন বিবেচনায়? ভগ্নিপতি মরতে না মরতে বয়ে আনতে হল, দুটো পাঁচটা দিন সবুর সইল না যে বিয়েটা দিয়ে নিই।

হারাণ বলেন, আমি না হয় নিয়ে এসেছি, দোষ করেছি। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকে কে আর দেখত? থাকত, খেত, ঘুমোত। তুমি যে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে পাড়ার মানুষ ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলে। দেশময় চাউর হয়ে গেছে। সেই শহর অবধি। বোঝ ঠেলা এখন।

বিদেয় করে দাও।

সে তো হয় না। পর নয়—আপন বোন-ভাগনী। উঠবে গিয়ে কোথায়? আমার নিন্দে রটে যাবে। বিয়ে দিয়ে রাধিটাকে বিদেয় করব। মনোও তাই বলে। কান্নাকাটি করে। ভেবেছিলাম, আরতি বয়সে বড়—তার বিয়েটা আগে হোক, তারপর দেখব। সে বোধ হয় হবার নয়। মুরারি হালদার কী বলে, শুনে আসি। ফিরে এসে কোমর বেঁধে রাধির জন্য লেগে যাব।

মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছেন কোন সময়। বলে উঠলেন, বিদেয় করতে না পার তো দাদা, কালিঝুলি মাখানো নয়, একদিন আমি এসিড ঢেলে দেব মেয়ের মুখে। উনি যখন নলহাটি পোস্টাপিসে, একটা মেয়ের মুখে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল। মা হয়ে আমাকেও তাই করতে হবে। চান করে নি ক'দিন, রুক্ষ চুল, তার উপরে ছেঁড়া ত্যানা পরিয়ে পাঠালাম,—সর্বনাশী তবু লঙ্কাকাণ্ড করে এল।

হারাণ চললেন মহকুমা শহরে মুরারি উকিলের কাছে। আরতি আর রাধিকে পাশাপাশি তুলনা করে মুখের উপরেই তো প্রায় সব বলে গেছে, রেখে-ঢেকে বলে নি। আরতি নয়, রাধিকে পছন্দ নবকান্তর—এই কথাটা ফলাও করে শোনানোর জন্য শহর অবধি টেনে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার?

তা নয়। নবকান্তর উপর মুরারি বিষম ক্ষেপে আছে। বলে, মুহুরি না ঘোড়ার ডিম। মামলার কাজকর্ম কী বোঝে আর কী করবে। ওর বাপের হাত এড়াতে না পেরে বক্সীমশায়কে বলেকয়ে সেরেস্তার ফরাসের কোণে একটু বসতে দিয়েছি। একটা অজুহাত সৃষ্টি করে মাসিক বিশ-তিরিশ টাকার সাহায্য করি। সেই ছোঁড়ার আবার বায়নাক্কা—এ মেয়ে নয়, ও-মেয়ে। বলি, মেয়ে কি ফেলনা মজুমদার মশায়, অমন পাত্রের হাতে কেন দিতে যাবেন? আমি যখন লেগে গেছি, মাস দুই-তিনের মধ্যে ভাল পাত্র জুটিয়ে আনব। কিচ্ছু ভাববেন না, বাড়ি গিয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোন গে যান।

কথার শেষ নয়, ভূমিকা মাত্র। হারাণ সেটা বুঝতে পারছেন। মুরারি একটুখানি কি ভাবল। আইনের একটা মোটা বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগল ফরফর করে। তারপর মুখ তুলে বলে, আমার ভাইকে দেখেছেন আপনি, চক বাসুদেবপুরে যে থাকে?

গোবিন্দ। সহোদর ভাই নয়, বৈমাত্রেয়। চক বাসুদেবপুরে হালদারদের প্রকাণ্ড সম্পত্তি। গোবিন্দ সেইখানে পড়ে থেকে সম্পত্তি দেখাশুনো করে। কালেভদ্রে এখানে আসে। দেখেছেন দু-একবার বটে, হারাণের স্মরণ হয়। বেঁটেখাটো রোগা মানুষটি, সর্বক্ষণ ছটফটিয়ে বেড়ায়। পলকের দেখা দেখেছেন, কথাবার্তা আলাপপরিচয় হয় নি।

মুরারি বলে, ভাইয়ের সংসারধর্মে মতি নেই, আধা-সন্ন্যাসীর মতন চকের কাছারি পড়ে থাকে। বউঠান মারা যাবার পর থেকে এই অবস্থা। কিন্তু হল তো অনেক দিন, আর কেন, পুরুষমানুষের সামলে নিতে হবে না? মা এদিকে বুড়ো হয়ে পড়েছেন, আমার স্ত্রী তো বছরের মধ্যে আঠার মাস শয্যাশায়ী, একজনের এসে শক্ত মুঠোয় সংসারের হাল ধরতে হবে। মা সেইজন্য বাসুদেবপুর থেকে ভাইকে খবর দিয়ে এনেছিলেন। সকলে মিলে চাপাচাপি করতে নিমরাজি

হয়ে গেছে। আগের সংসার ছিল, বয়সও হয়ে গেছে খানিকটা—আপনার মেয়ের সঙ্গে কোন সাহসে প্রস্তাব তুলি, বলুন। তাই মা বলছেন, আপনার ভাগনী রাধারাণীকে যদি দান করেন, হালদারবাড়ি আমরা লক্ষ্মীবরণ করে তুলব।

বনেদি গৃহস্থ হালদাররা, রীতিমত অবস্থাপন্ন। সম্পত্তির আয় আছে, তার উপরে ওকালতি করে মুরারি অঢেল পয়সা পিটছে। রাধারাণীকে নজরে ধরেছে। নয়তো আরতির সঙ্গে হলেও শান্তিবালা খুব যে একটা আপত্তি করতেন তা নয়। কথার মারপ্যাঁচে মুরারি উকিল ভদ্রভাবে সেটা এড়িয়ে গেল।

ভাবতে গেলে হাতে স্বর্গ পাওয়ারই ব্যাপার। তবু হারাণ বললেন, আমার বোনকে একবার না জিজ্ঞাসা করে কী বলি। বিধবা মানুষ। ওই তো এক মেয়ে তার—

মুরারি সঙ্গে সঙ্গে বলে, জিজ্ঞাসা করবেন বইকি। ছেলের বয়স হয়েছে, আগের বউ মারা গেছে, সমস্ত বলবেন। খরচখরচা একটি পয়সা নেই, শাঁখা-সাড়ি দিয়ে সম্প্রদান। ওরাও একবার কিন্তু মেয়ে দেখতে যাবে বাসুদেবপুর থেকে। আপনাদের মতামতটা পেলে তার পরে যাবে।

হারাণ যে খবর নিয়ে ফিরবেন, সে এক রকম জানা-ই। তবু মনোরমা প্রত্যাশা করে আছেন। আরতির সম্বন্ধ পাকা করে আসবেন, রাধিকে নিয়ে ভণ্ডুল ঘটবে না তার মধ্যে। কাপাসদা'র ঠাকুর গোপালের কাছে শতেক বার মনে মনে মাথা খুঁড়ছেন।

কিন্তু ফেরার পর হারাণের মুখের চেহারা দেখে কোন আর সংশয় রইল না। এগিয়ে এসে তবু প্রশ্ন করেন, খবর কি দাদা?

একদিকে খারাপ, আর একদিকে ভাল। ভাল যেটুকু, সে হল আশার অতীত।

শোনা গেল সবিস্তারে। শান্তিবালা সে সময়টা পাড়ায় বেরিয়েছেন। ধীরে-সুস্থে হারাণ তাই বলতে পারলেন। নবকান্ত ছোঁড়াটা উকিলের অনুরোধ সত্ত্বেও আরতিকে নাকচ করে দিল। অথচ আগেও সে কনে দেখেছে—দেখেশুনে তবে তো এগুল। রাধিকে দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে।

মনোরমা সভয়ে বলেন, বউ শুনে রক্ষে রাখবে না। মেয়ের মা তাকেই বা দোষ দিই কেমন করে? আর কাজ নেই, আমরা কাপাসদা'য় চলে যাই দাদা। আরতির বিয়েথাওয়া হয়ে যাক, তারপরে আসব।

হারাণ বলেন, রাধির জন্যে চলে যাবি—তার বিয়ে এখনই তো হয়ে যায় তুই যদি মত করিস।

ওই নবকান্তর সঙ্গে? না দাদা, মত নেই আমার। লোকে কি বলবে! আরতিরই বা কী রকম মনে হবে!

মুহুরির সঙ্গে নয়। উকিলবাবুরই বড্ড পছন্দ রাধারাণীকে। নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ধরেছেন। ভাই অবশ্য বৈমাত্রেয়। কিন্তু একান্নবর্তী। শহরের উপর মস্তবড় দোতলা বাড়ি তাঁদের। বাসুদেবপুর চকের রকম বারআনার মালিক—সেখানে পাকা কাছারি। পাত্র সেখানে থেকে তালুক-মুলুক দেখাশোনা করে। উকিলবাবু বললেন, মেয়ে তো রাজকন্যে। মুহুরির হাতে দেবেন কি, এই হালদারবাড়ি আমরাই বরণ করে আনব। আশার অতীত তবে আর কী জন্যে বলি!

ফড়ফড় কয়েকবার টেনে হুঁকো থেকে মুখ তুলে হারাণ বলেন, তবে হ্যাঁ, খুঁতও আছে। ছেলের রং কাল। আমি ভাসা-ভাসা দেখেছিলাম সেবারে, খতিয়ে দেখে নি। মুহুরি ছোঁড়াই বলল। কাল মানে বেশ কাল।

মনোরমা বলেন, হোক গে। ছেলে কাল আর ধান কাল। তাছাড়া ভাগনী তো তোমার ফর্সা আছে। ছেলেপুলে খুব একটা কুচ্ছিৎ হবে না।

ছেলে দোজবরে। উকিলবাবু বললেন সেটা। নবকান্তটা আবার ফিস-ফিসিয়ে বলে, দোজবরে নয়, তেজবরে। ছোঁড়াটার মনের জ্বালা, বানিয়ে মিথ্যেও বলতে পারে।

বলছেন হারাণ, আর ফিকফিক করে হাসেনঃ মুহুরি ছোঁড়ার কান্ড দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধাঁ করে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এল। বলে, বড়-বাড়ির সম্বন্ধ—কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, পাত্র তেজবরে। আমি বললাম, বুঝতে পেরেছি বাবাজি তোমার মনোগত ইচ্ছে। শুভকর্মে ভাংচি দিতে এসেছ। ধামার মতো আশাটা তোমার, কিন্তু হাতে যে মধুপর্কের বাটিও ধরে না। অতি-লোভের মুখে ছাই।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে মনোরমা তাড়াতাড়ি বলেন, ছেলে-মেয়ে নেই যখন, দোজবরে হোক আর তেজবরে হোক, এ শুধু গাল একটা। সম্বল আমার জান তো দাদা। তার মধ্যে সমস্ত সারতে হবে। বেশি খুঁতখুঁত করলে হবে কেন?

সম্বল তোর পুরোপুরি থেকে যাবে মনো। এক আধলাপয়সাও খরচ নেই। মুরারি উকিল খোলাখুলি সব বলে দিয়েছে। রোখ চেপেছে, এ মেয়ে নেবেই ওরা ঘরে—

সহসা গলা খাটো করে হারাণ বললেন, লোকে বলবে মেয়ে বেচা। নয়তো উল্টে কিছু পাইয়েও দিতে পারি। কী বলিস তুই?

শান্তিবালা সমস্ত শুনলেন। বিয়ে আরতির না হয়ে রাধারাণীর হতে যাচ্ছে, যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বলা হল কথাটা। শান্তিবালা প্রসন্নই হলেন, মনে হয়। হালদারবাড়ির তেজবরে পাত্র না হয়ে রাজা রাজবল্লভের খাস নাতি হলেও বোধ হয় বেজার হতেন না। রূপবতী মেয়েটা সরে যাক চোখের উপর থেকে, আরতির বিয়ে তারপরে আর আটকে থাকবে না।

চক বাসুদেবপুর থেকে কনে দেখতে এল—পাত্র গোবিন্দ হালদার নয়, তার বন্ধু পূর্ণশশী সেন। পেশায় কবিরাজ, ও-তল্লাটের লোক পূর্ণশশীকে এক-ডাকে চেনে। পাত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, কথাবার্তায় সেটা বোঝা যায়। রাধারাণীর আপাদমস্তক বারকয়েক নিরীক্ষণ করে শুধুমাত্র নামটা জিজ্ঞাসা করে পূর্ণশশী রায় দিয়ে দিলঃ দিন স্থির করে ফেলুনগে মুরারিবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে। পাত্রের দিক থেকে কিছু বলবার নেই।

মুরারিও তাই বলে হারাণকেঃ পূর্ণশশী কবিরাজের কথা আমার ভাইয়েরই কথা। ভাইয়ের কথার চেয়ে বরঞ্চ বেশি আস্থা করি যদি সেটা পূর্ণশশীর মুখ দিয়ে বেরোয়।

শুভকর্ম নির্বিঘ্নে চুকে গেল। শান্তিবালা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন। মেয়ের বিয়ের সবচেয়ে বড় বিঘ্নটা বিদায় হল বাড়ি থেকে।

= পাঁচ =

আর একটা কথার প্রচার নেই। গোবিন্দ হালদার বয়সে কিছু বড় মুরারির চেয়ে। লিকলিকে দেহ বলে এমনি দেখে বোঝা যায় না। দেহ যা-ই হোক প্রতাপ বিষম। গলায় যেন ঝাঁঝ-ঘণ্টা বাজে। বাসুদেবপুরের প্রজারা তটস্থ বড়বাবুর দাপটে। ফুলশয্যার রাত্রে মেয়েদের কাছেও তার কিছু পরিচয় দিল।

তিন বোন এসেছে বিয়ে উপলক্ষে। আর মুরারির বউ ছবি। তা ছাড়া এবাড়ি ওবাড়ির কয়েকটা মেয়ে এসে জুটেছে। বড় বোন অমলা ডাকাডাকি করেঃ রাত যে পুইয়ে যায় দাদা। তুমি ছাড়াও পরিবেশন করার লোক আছে। নতুন বউ ঘুমে ঢুলছে।

বারম্বার বিরক্ত করায় গোবিন্দ খিঁচিয়ে ওঠেঃ শাস্ত্রীয় রীতকর্ম যেটুকু নইলে নয়, তাই করবি। এক কাঁচ্চা বেশি নয়। এক গাদা ফক্কড় মেয়ে জুটিয়ে এনে ভোররাত্রি অবধি ফষ্টিনষ্টি চালাবি তো জুতিয়ে লাট করব কিন্তু।

স্থান-কাল জ্ঞান নেই গোবিন্দর। বাইরের কত মেয়ে এসেছে, একরকম তাদের সামনেই। মেজ বোন অপর্ণার ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ির আদরের বউ। সে গ্রাহ্য করে না। দূরে ছিল, একেবারে কাছে সামনাসামনি ঝড়ের মতন এসে পড়েঃ কী, কী বললে? কী এমন বাল্মীকি মুনি রে! একটা দিন বরবউকে নিয়ে অমন ফষ্টিনষ্টি করে থাকে মেয়েরা।

গোবিন্দ বলে, সে একটা দিন কবে হয়ে গেছে! একটা কেন দু-দুটো দিন হয়েছে।

কিন্তু বউ হয়ে যে এল, তার তো এই প্রথম। তার মনে সাধ-আহ্লাদ আছে তো! তার সাধ মেটাতে পারবে না, আবার তবে ছাতনাতলায় বসতে গেলে কি জন্যে?

অপর্ণার মুখের কাছে গোবিন্দ জব্দ। তাড়াতাড়ি সুর পাল্টে নিয়ে রসিকতার প্রয়াস করে—আবাদ জায়গায় পড়ে-থাকা মানুষের মোটা রসিকতা। বলে, সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়। ছাতনাতলায় কেন গেলাম, তুই কী করে জানবি শ্বশুরবাড়ি থেকে। বরঞ্চ ছোট বউমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস। কামরূপ-কামিখ্যের মোহিনী কন্যে—গুণ জানে। যে দেখে সে-ই মজে যায়। মুরারি একেবারে নাছোড়বান্দা। তারপরে বলেকয়ে কবিরাজকে তিলডাঙা পাঠালাম, সে-ও দেখি ওই দলে ভিড়ে পড়ল।

অপর্ণা অধৈর্য হয়ে এসে হাত ধরলঃ চল—

কী জ্বালা, টানাটানি করিস কেন? ভাল ভাল লোক এখনো বাকি রয়ে গেছেন। সেকেন্ড-কোর্টের পেস্কার মশায় আসেন নি।

ডাক্তারে কবিরাজে ওদিকে দাবায় বসে গেলেন—হীরালাল ডাক্তার আর আমাদের পূর্ণশশী। নিদেন একটা বাজি না হয়ে গেলে কিছুতে ওঠানো যাবে না। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁদের সব খাওয়াতে হবে। আগেভাগে ফুল-শয্যার খাটে চড়ে বসলে কী ভাববেন বল দিকি? পূর্ণশশীটা বড্ড মুখফোঁড়ঃ বলে বসবে, সন্ধ্যেবেলা চড়কে চাপলে, দু-দু'বারেও শখ মিটল না? কথার ভয় করি বড্ড ওর।

অমলা বলে, এগারটা বেজে গেছে, সন্ধ্যে হল তোমার এখন! চল বড়দা, বউ ঘুমিয়ে পড়ছে।

মিছে কথা, বয়ে গেছে রাধারাণীর ঘুমুতে। ঠায় বসে আছে। বুক ঢিব-ঢিব করছে তার। বর দেখেছিল মামার বাড়ি প্রথম যখন গোবিন্দ এসে বরাসনে বসল। লুকিয়ে দেখে নিয়েছিল। শুভদৃষ্টির সময়টা তারপরে সে চোখ বন্ধ করে ছিল। বর হয়তো ভেবেছে লজ্জা। আসলে ভয়। ফুলশয্যার হোক না দেরি আরও, বিশিষ্ট যাঁদের আসবার কথা সকলে এসে যান। সকাল হয়ে যাক। নেহাৎ পক্ষে এমন সময় ঘরে নিয়ে আসুক, রীতকর্ম সারতে সারতে পাখপাখালি ডেকে ওঠে। ননদদের সঙ্গেই যাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে রাধারাণী।

তা হল না, তিন বোনে টেনেটুনে গোবিন্দকে ঘরে আনল। ছবি আসে নি। রোগা মানুষ, কোলে-কাঁকালে চার ছেলেমেয়ে, পেটেও এসেছে আবার একটি। তাছাড়া ভাসুরের বাসরে ভাদ্রবউ হয়ে আসবেই বা কেন? পাড়ার মেয়েদেরও কারো উৎসাহ নেই, গোবিন্দর মধুবাক্য কানে গিয়েছে নিশ্চয় কারও কারও। খেয়েদেয়ে যে যার বাড়ি চলে যাচ্ছেঃ দূর, গোবিন্দ হালদারের ফুলশয্যা নতুন করে কি দেখব? আগে দেখেছি তো কতবার। বর মুখ ভোঁতা করে থাকবে, রসের কথা বলবে না একটি। অন্য কেউ বললে হাসবে না। আর হাসেও যদি, গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে হাসি হারিয়ে যাবে—কারও নজরে আসবে না।

শেষ অবধি ওই তিন বোন—রাধির তিন ননদ। বউয়ের ঘুম ধরেছে বলছিল, কিন্তু গোবিন্দই তো ঢলে ঢলে পড়ছে বোধ করি খাটনির ক্লান্তিতেই।

অপর্ণা ফিসফিসিয়ে বলে, ছুতো। জান বউদি, তাড়াতাড়ি যেতে বলছে আমাদের। গেলে তখুনি নিজ মূর্তি ধরবে। তোমারও সেই ইচ্ছে—অ্যাঁ?

মোটাসোটা নিটোল গড়ন অপর্ণার। বর্ষার পরিপুষ্ট কলার বোগের মতন। যৌবন সামাল মানে না, পাতলা শাড়ি ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে। মুখেও অবিরত অসভ্য কথাবার্তা, ঠারেঠোরে স্থূল ইঙ্গিত। বলে, সবুর সইছে না মোটে! আচ্ছা, যাই চলে তবে।

রাধি হাত জড়িয়ে ধরে বলে, যেও না ভাই। সত্যি সত্যি বলছি। ভয় করছে আমার।

ভয় তরাসি দেখনহাসি!—আট বছরের খুকি এসেছেন, ভাজা-মাছ উল্টে খেতে জানেন না!

কেমন করে বোঝাবে রাধারাণী, মুখের কথা মোটেই নয়—মনে প্রাণে চাইছে, থাকুক—এই অপর্ণা থাকুক রাধিকে জড়িয়ে ধরে। রাতটুকু নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিয়ে চলে যাবে।

আরও জোরে হাত চেপে ধরেছে, আর অপর্ণা তো হেসে খুনঃ থাক, ঢের হয়েছে। ভয় করে তো নেমে গিয়ে মেজেয় মাদুর পেতে ঘুমিও। সেখানেও যায় তো চেঁচিয়ে উঠবে হাউমাউ করে। আমরা আশেপাশে সব রইলাম।

হেসে আবার বলে, আমি ঘুমুচ্ছি না বউদি। ঘুমোতে দেবে না তোমার ঠাকুরজামাই।

নতুন বউয়ের সঙ্গে আরও খানিকটা ফিসফিস গুজগুজ করে হেসে লীলায়িত ভঙ্গিতে বাসরের সর্বশেষ মেয়ে অপর্ণা বেরিয়ে যায়। কত গন্ধ মেখে এসেছিল মাগো—চলে গেছে, গন্ধ ভুরভুর করছে তবু। আর কথায় ও ইসারায় যা সমস্ত বলে গেল, দেহে মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। একটুকু থমকে দাঁড়িয়ে অপর্ণা আবার বলে, দেখেশুনে দুয়োর বন্ধ করে শোবে বউদি ভাই। চোরের উৎপাত। এই বড়দা'রই আগের ফুলশয্যায় দুটো চোর লুকিয়ে ছিল খাটের তলে। আমি আর দিদি। ঠাকুরমা তখন বেচে, তিনি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। বড়দা তো রেগে টং—

রাধারাণী নতুন বউ, সে কেন দরজা দিতে যাবে? যাদের বাড়ি, সেই মানুষ উঠে দিয়ে আসুক। কিন্তু ওরা চলে যেতে না যেতে গোবিন্দ নেতিয়ে পড়েছে একেবারে। রাধি আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। নতুন জায়গা—চোরের কথা বলল, সত্যি চোরেও তো ঢুকে পড়তে পারে। আস্তে আস্তে এক সময় উঠে দরজায় হুড়কো তুলে দিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় ফিরছে, প্রদীপের আলোয় দেখল—হাঁ, সে স্পষ্ট দেখেছে—চোখ মিটমিট করছিল গোবিন্দ এতক্ষণ। ঘুমোয় নি, ঘুমের খেলা। নতুন বউ মুখ ফেরাতেই আগের মতন আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

রাধিও ঘুমিয়ে পড়ুক তবে। ভাল হল, শাপে বর হয়ে গেল। এমন ঘুম ঘুমাবে, ময়দা পেশার মতো চটকাচটকি করে ধরে বসিয়ে দিয়েও তাকে জাগাতে পারবে না। কিছুতে জাগবে না, এই পণ। বিশাল খাটের শেষ প্রান্তে গুটি-সুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। নতুন বউ আর বরের মাঝখানে অন্তত আরও দু-জনের শোয়ার মতন ফাঁক।

এবং সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন কত বড় ধকল গিয়েছে—এমন ক্ষণেও ঘুমিয়ে পড়া যায়। কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙে যায় হঠাৎ। শিরশির করে পোকামাকড় হাঁটছে যেন গায়ের উপর দিয়ে। জানত, এমনিধারা

হবে। রাধির সহচরীদের মধ্যে চার-পাঁচ জনের বিয়ে হয়েছে। সকলের চেয়ে বেশি ভাব চাঁপাফুল ভক্তিলতার সঙ্গে। কত সব গল্প করে ভক্তিলতা আর সেই সব মেয়েরা। কত সব রসালো ঘটনা। যাঃ, অসভ্য—ভক্তিলতার মুখ সরিয়ে দিয়েছে। হেসে হেসে আরও রসিয়ে ভক্তিলতা তার নতুন অভিজ্ঞতার কথা বলত। আর বিরক্তির ভান করে রাধারাণী দুই কানে গিলে এসেছে সেই সব। তার জীবনে আজকে সেই ব্যাপার। এখনই। পোকামাকড় নয়, গোবিন্দর হাত চোরের মতন রাধির অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চরণ করছে। ক'টা দিন আগে যে পুরুষ একেবারে অচেনা ছিল, তার হাতের আঙুল। গায়ে কাঁটা দিয়েছে রাধির। জেগেছে, কিন্তু চোখ খোলে না। একখানা কাঠ হয়ে পড়ে আছে। চোখ খুলছে না বর দেখতে হবে, সেই ভয়ে। কোদালের মতন বেরিয়ে-আসা থুতনি, থুতনির উপর দিকে গুহার ভিতরে ঢুকে-যাওয়া ঠোঁট,—গোঁফের জঙ্গলের ভিতর লুকানো সে-বস্তু অনুমান করে নিতে হয়। জঙ্গলের ঊর্ধ্বে অত্যুচ্চ নাসিকা-শিখর। শিখর ঢালু হয়ে যেখানে ললাটে মিশেছে তার দু-দিকে বটিকা প্রমাণ চোখ দুটো। রাধারাণী না তাকিয়েও বুঝতে পারে গোবিন্দর সেই কুতকুতে চোখ দুটো জ্বলছে এখন।

যা খুশি করুক। নইলে চক বাসুদেবপুরের বৈষয়িক কাজকর্ম ফেলে বিয়ের এত হাঙ্গামায় মানুষটি আসতে যাবে কেন? বিশ-বাইশ বছর ধরে লালন-করা কৌমার্য কেড়ে নেবার অধিকার পেয়েছে মন্ত্রপাঠ করে। প্রতিকার নেই, শাস্তিটা নিতেই হবে নির্বিকারে।

চোখ বুজে আছে এখন—চোখ বুঁজেই থাকবে বর যত দিন না পুরানো হয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দ ভাববে, বউ লাজুক—দোষ না হয়ে বরঞ্চ সেটা গুণেরই হবে। কালধর্মে সব-কিছু সয়ে যায়, অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর চোখে লাগবে না। ছোটবেলায় একটা কাল কুকুর-বাচ্চা দেখে ভয়ে সে দরজায় খিল দিত, সেই কুকুরকেই আ-তু-উ-উ বলে ভাত খাইয়েছে কত দিন, গায়ে কত হাত বুলিয়েছে।

এমনি ভাবছিল এলোমেলো। খেয়াল হল, হাত সরিয়ে নিয়েছে গোবিন্দ। সাড়াশব্দ নেই, নিঝুম অবস্থা। দারুণ তৃষ্ণা বোধ করে রাধারাণী, এক কলসি জল খেলে তবে বোধ হয় গলা ভিজবে। মানুষটা ঘর ছেড়ে নিঃসাড়ে চলে গেল নাকি? খুলতে হয় চোখ। দূরে সেই আগেকার জায়গায় মড়া হয়ে পড়ে আছে। না, ঠিক মড়া নয়—তাকাচ্ছে রাধারাণীর দিকে। চোখোচোখি পড়ে গেল। কাপড়চোপড় ঠিক করে নেয় রাধি, ব্লাউজের বোতাম এঁটে দেয়। কথাও ফুটল যে ও-পাশের ওই মড়ার মুখেঃ উঃ, কী গরম! হাতপাখা তুলে নিয়ে গোবিন্দ জোরে জোরে বাতাস খাচ্ছে।

গরম রাধিরও। জ্বর উঠেছে যেন গায়ে, গা পুড়ে যাচ্ছে। খাট মচমচ করে হঠাৎ গোবিন্দ উঠে পড়ে। পিছন দিককার দরজা খুলছে। খোলা কি সোজা—

বাক্সপেঁটরায় ঠাসা দরজার খোপ। আগে সেগুলো সরাতে হল। আমবাগান ও ঝোপঝাপ ওদিকটা। খিড়কির পুকুর। কোথায় চলল গোবিন্দ নতুন বউকে একলা ফেলে? ভয়ে ভয়ে রাধারাণী উঠে পড়ে। দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। চাঁদ উঠেছে বেশি রাত্রে, আমের ডালের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। গোবিন্দ খিড়কি-ঘাটে গেল, ডুবে মরতে নয়—ঘটি ভরে হুড়হুড় করে জল ঢালে মাথায়। দু-হাতের কনুই অবধি ধোয়, হাঁটু অবধি ডুবিয়ে খানিকক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে মুখে জল ছিটায়। তারপর গামছায় হাত-পা-মাথা ভাল করে মুছে আবার ঘরে আসছে। রাধি শুয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি। গোবিন্দ যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনিধারা পড়ে আছে। চোখ বন্ধ করে অসাড় হয়ে রাধি অপেক্ষা করছে। গরম কাটিয়ে এসে বর আবার কি করে দেখ।

ঝিঁঝিঁ ডাকছে ঝিমঝিমঝিম—তা ছাড়া একেবারে নিঃশব্দ। বৈঠকখানার দেয়ালঘড়িতে টং করে একবার বাজল। রাত একটা। অথবা দেড়টা আড়াইটা সাড়ে-তিনটাও হতে পারে। আধ ঘণ্টা হবার সময়েও একবার শুধু বাজে। কিন্তু কই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? চোখ মেলে দেখে, নিদ্রা কি জাগরণ জেনে কোন লাভ নেই। দাঁড়ি-টেনে দিয়েছে এই ফুলের শয্যার উপর। ডাইনের পাশবালিশ মাঝে এনে দিয়ে পাশবালিশের ব্যূহের আড়ালে চোখ বুজে আত্মরক্ষা করছে। করুণা হল রাধারাণীর। আঙুলের স্পর্শ এক সময় পোকামাকড় ভাবছিল—দুর্ধর্ষ গোটা লোকটাকে এবার পোকামাকড় বলে মনে হয়। রাধির পাশবালিশ বাঁয়ের দিকে। সেই পাশবালিশটা তুলে এনে অন্যটার গায়ে রাখল। ডবল দাঁড়ি পড়ল। দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ফুলশয্যায় বর-বউয়ের না হয়েছে তো বালিশ দুটো গায়ে গায়ে থাকল।

= ছয় =

সকালবেলা ঘাড়ে লাগে ওই অপর্ণাটা। মুখ বিষম আলগা। বলে, জানি গো, জানি সমস্ত। রাত দুপুরে পুকুরঘাট তোলপাড়। ঘুমুচ্ছিলাম তো আমি—তোমার ঠাকুরজামাই ঠেলাঠেলি করে জাগালঃ শুনছ গো, ওই শোন। ঘাটে গিয়ে ওরা জলের ঢেউ দিচ্ছে। বললাম, গোসাপ জলে পড়েছে। ছেঁদো কথায় ভোলবার মানুষ কিনা! ঢেউ এসে তারপর আমার উপরে পড়ে।

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে বলে, আমায় দোষ দাও কেন ঠাকুরঝি। আমি ওর মধ্যে নেই। তিন সত্যি করছি। গোসাপ বলেছিলে তুমি—তা আদ্য অক্ষরে মিল আছে। সাপ বল আর মানুষ বল, গো বটে উভয়েই।

খিলখিল হাসি। হেসে গড়ায় দু-জনে। তারপরে আর দুই ননদ ও ছোটবউ ছবি এসে পড়ে। এবাড়ি-ওবাড়ির আরও দু-তিনটি মেয়ে। দিনটা আমোদে কেটে যায়।

এরই মধ্যে এক কাণ্ড। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর অপর্ণা বলে, বড়দা পাশা খেলতে বেরিয়ে গেল, এস বউদি আমরা তাস খেলি। মাদুর পেতে নিল দালানে। তাস বের করল। বলে, তাসখেলা জান তো ভাই বউদি? যা জান তাতেই হবে। আমরাও আনাড়ি।

বসে পড়ল। তাস ভাঁজছে। ডাবরে পানের খিলি, ডাবর পাশে নিয়ে বসেছে। কপকপ করে খিলি মুখে ফেলছে। মুখ বিকৃত করে বলে, পান খাচ্ছি না ঘাস চিবোচ্ছি বোঝা যায় না। হুঁ, মুস্কিপাতি জর্দা আছে বড়দা'র। কৌটোটা তোমার ট্রাঙ্কের উপর। এনে দাও না ভাই বউদি।

আছে সত্যি। রাধারাণী দেখেছে সেই কৌটো। ঘরে ঢুকেছে, ঝনাৎ করে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে দরজায় শিকল। আর উচ্ছ্বসিত হাসিঃ তাসখেলা তুমি মোটেই জান না বউদি, তোমায় নিয়ে চলবে না। যে খেলা জান, তাই খেল। জানলাটা দিয়ে দাও। চারটের পর শিকলি খুলে দেব।

তাকিয়ে দেখে, সত্যিই রে—খাটের উপর লম্বা হয়ে পড়েছে গোবিন্দ। ঘুম—ভেকধরা ঘুম নয় কাল রাত্রের মতন। মা গো মা, কত রকম কারসাজি জানে যে অপর্ণা! আগে থেকে শোনাচ্ছে, গোবিন্দ পাশাখেলায় বেরিয়ে গেছে। তাস আর পানের ডাবর সাজিয়ে নিয়েছে। তিলেক সন্দেহ না আসে মনে। ফাঁদ সাজিয়ে রেখে পাখিকে যেমন তার মধ্যে এনে ফেলে। কিন্তু এই জায়গায় না আটকে বাঘের সঙ্গে এক খাঁচায় দিলে অনেক ছিল ভাল। বাঘের সঙ্গে কিছুক্ষণ হয়তো বা থাকা যায়, কিন্তু দিনমানে আলোর মধ্যে পতি-পরম-গুরুর সন্নিধানে সর্বদেহ হিম হয়ে আসে যে!

দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। পথ আছে পালাবার। পিছন দিককার দরজা—যে দরজা খুলে গোবিন্দ কাল রাত্রে পুকুরঘাটে গিয়েছিল। দরজার খোপের বাক্সপেঁটরা সরিয়ে পথ করা আছে, সেটা খেয়াল করে নি অপর্ণা। দেরি নয়। চক্ষের পলকে বেরিয়ে পড়ল রাধারাণী। ঘরে আবার ওদের তাসের আড্ডায়। তুমি বেড়াও ডালে ডালে, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়। পারলে আটকে করতে?

ও মা, কেমন করে বেরুলে? বড়দা ছেড়ে দিল? মুখে কেবল তম্বি, কাজে কিছু নয়! পড়তে একবার তোমার ঠাকুরজামাইয়ের পাল্লায়—

অমলার বয়স এদের সকলের বেশি। সে ধমক দেয়ঃ বেশ করেছে। দিন দুপুরে বর নিয়ে শোবে—গেরস্তঘরের বউ এত বেহায়া কেন হতে যাবে? বর তো রইলই—ফুরিয়ে যাচ্ছে না বর। চিরকাল ধরে থাকবে।

অপর্ণা কানে কানে বলে, দেখ বউদি, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। গুরুজন হলেও না বলে পারি নে। তোমার হল পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ। ক'দিন বা আছে দাদা বাড়িতে! বাসুদেবপুর চলে যাবে। রসগোল্লা যতক্ষণ মুখের সামনে, গোগ্রাসে গিলে খাও।

একবার বেরিয়ে এসেছে, আর ওমুখো নেওয়া যাবে না রাত্রের আগে। রাত্রিবেলা রান্নাঘরে খেতে খেতে মেয়েদের গল্প চলছে। খাওয়া হয়ে গেছে, আর সকলে উঠতে যায়—রাধারাণী বলে, শুনুন না দিদি, তারপরেও আছে। নতুন গল্প জমিয়ে বসে আবার একটা। বউয়ের শুধু রাণীর মতন চেহারাই নয়, অনেক গুণ। দু-দিনে আপন করে নিয়েছে জা-ননদদের। অমলা তাই বলছে, বাপের বাড়ি আমরা কতবার আসি। শুয়ে বসে খেয়ে কাজ করে এত মজা কখনো পেয়েছি? একটা মানুষ পা দিয়েই বাড়ির চেহারা বদলে দিয়েছে।

অপর্ণা বলে, ননদিনী রায়বাঘিনী। বাঘিনীদের বশ করে ফেলেছে বউদি, বড়দা'কে ভেড়া বানাবে। কখন বড়দা ঘরে চলে গেছে, হা-পিত্যেশ চেয়ে আছে—ওঠ দিকি এইবারে।

রাধারাণী বলে, ঠাকুরজামাই চলে গেলেন, তুমি তো ভাই একলা। আজ আমি তোমার সঙ্গে শোব।

অপর্ণা বউয়ের গালে ঠোনা মেরে কানে কানে বলে, তোমার সঙ্গে শুয়ে লাভটা কি আমার শুনি? বরঞ্চ গোলমাল হবে। ঘুমের মধ্যে তুমি আমায় বড়দা ভেবে নেবে। আর আমি ভাবব— ।

এমনি অসভ্য কথা—মেয়েয় মেয়েয় হলেও লজ্জায় রাধারাণীর গাল রাঙা হয়ে ওঠে।

ছবি তাড়া দিয়ে ওঠে। বড় জা হলেও রাধি বয়সে অনেক ছোট। বলে, সেকেলে লজ্জাবতীদের হার মানিয়ে দিলে বড়দি। যাও এবারে, ঢের হয়েছে। আমাদেরও তো ঘুমটুম আছে, না সারা রাত বকরবকর করলে চলবে!

সমুদ্রে কূল দেখা যায় না কোন দিকে। কী করবে এখন রাধি, আর কী বলতে পারে এদের? ঘরে না যাবার জন্য যত কৌশল, এরা সমস্ত লজ্জা বলে ধরে নিচ্ছে। তার গরিমা বেড়ে যাচ্ছে। জা-ননদের কর্তব্যই হল প্রতিবাদ কানে না নিয়ে ঠেলেঠুলে বরের ঘরে পেঁাছে দেওয়া।

অপর্ণা বলেও তাইঃ শোন, অমন যদি কর তিন বোন আর ছোট বউদি মিলে চ্যাংদোলা করে ছুঁড়ে দেব বড়দা'র কোলের মধ্যে।

সে কাজ সত্যি সত্যি পারে না, এমন নয়। চারজন, আর সে একলাটি। কতক্ষণ লড়বে তাদের সঙ্গে? মধুসূদনের নাম স্মরণ করে। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ, সঙ্কটে মধুসূদন—ছোটবেলায় বাপের মুখ থেকে শ্লোক মুখস্থ করেছিল। চিরকালের ডাংপিটে মেয়ে, বাজি রেখে শ্মশানের কুলগাছের ডাল ভেঙে আনার মেয়ে। আরও ছোট যখন, রাধি দাঁতাল-শুয়োর মারা দেখতে গিয়েছিল বাগানের ভিতর। শড়কির ঘা খেয়ে দাঁতাল গোঁ ধরে ছুটেছে, রে-রে-রে রব উঠেছে চতুর্দিকে—মেয়ে তখন ফনফন করে খাড়া জামগাছের উপরে চড়ে বসল। গাছে তার আগে কখনো ওঠে নি, কিন্তু অবলীলাক্রমে গেল উঠে। এমনি সব অসমসাহসী কাজ করে এসেছে, আর বরের ঘরে যেতে পারবে না এখন! হাত ছাড়িয়ে নিল সে ঘরের সামনে এসে, মাথার ঘোমটা ফেলে দিল। হঠাৎ যেন এক ভিন্ন মেয়ে। সাহেবরা বলে, গুডনাইট—সেই শোনা কথাটা এদের বলে হেসে সশব্দে সকলের মুখের উপর দরজা এঁটে দেয়।

তাকাচ্ছে একদৃষ্টে গোবিন্দর দিকে। হাসে। জোরে জোরে পা ফেলে চলে গেল খাটের পাশে।

ঘুমুলে?

ঘুমন্ত মানুষ সাড়া দেবে কেমন করে? হাসে রাধি খলখল করে। বলে, কাল ঘুমুলে, দুপুরে ঘুমুলে, আবার এখনো ঘুমুচ্ছ—বেশ মজার মানুষ হয়েছি তো আমি, কাছে এলেই তোমার ঘুম পেয়ে যায়।

অপর্ণার সাগরেদ হয়ে পড়েছে রাধি—অপর্ণা সে খবর জানে না। সেরা সাগরেদ। এই দুটো দিনে দাম্পত্য গল্প সে-ও অনেক করেছে রাধির সঙ্গে। সবই যে সত্যি, বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অসম্ভব নয়—ঘটানো যেতে পারে তেমনটি। অপর্ণা পেরে থাকে তো রাধি কেন পারবে না। কিসে ছোট সে। বাজি রেখে রাতদুপুরে শ্মশানঘাটে চলে গিয়েছিল—তার অসাধ্য কি আছে?

গোবিন্দ আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা দিয়ে আছে। কচ্ছপ যেমন খোলার মধ্যে থাকে। সেই চাদরের প্রান্ত শক্ত মুঠিতে এ'টে ধরল রাধারাণী। একটানে সরিয়ে ফেলবে। টানতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে খুলে দিল মুঠি। হেরিকেন-আলোর জোর কমানো। কেমন এক আতঙ্ক হল, আলো মৃদু হলেও মুখ দেখা যাবে যে গোবিন্দর। দাঁড়কোদাল মডেল করে বিধাতাপুরুষ যে থুতনিখানা গড়েছেন, গোঁফের নিচেয় যে মুখটা বর্ষার গাছগাছালিতে ঢাকা ডোবার মতন। চোখে দেখতে না হয়—হেরিকেন নিভিয়ে ঘর পুরোপুরি অন্ধকার করে নিল। এবারে পারবে। ভূত-পেত্নীর সেই কুলগাছের ডাল ভেঙেছিল, আর নিষুতি আঁধারে বরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না?

বউ ঘুমিয়েছে জেনে তুমি কাল যে খেলা খেলতে গিয়েছিলে, তাই আজ রাধির। খানিকটা খানিকটা অপর্ণা তার কাছ থেকে শুনে নিয়েছে—ওষুধ বাতলে দিয়েছে সে-ইঃ ন্যাকা মেয়ে। আট-বছরে গৌরী-দান করে পাঠায় নি তোমায়। বয়স বিশ বছর বলেছে—কোন্‌ -না বাইশ-চব্বিশ। বড়দাও পাঠশালের পড়ুয়া নয়—দু-দুটো তাগড়া বউ পার করেছে। ছেড়ে কথা বলবে না আজ, কিসের অত! ঘুম ভাঙিয়ে তবে ছাড়বে। ঘুমিয়ে থাকবে তো বিয়ে করা কেন আবার নতুন করে?

ঘরে যখন আসতে হল—আসা কিছুতেই রদ হল না—অতএব এইমাত্র পথ। অন্ধকার আছে, ভয়টা কিসের? বর লাফিয়ে উঠে পিটুনি দেয় যদি? সে ভাল, অনেক ভাল। জীবন্ত আছে, প্রমাণ পাওয়া যাবে তখন। পিটুনি সহ্য হবে, কিন্তু কালকের মতন অমনধারা লাঞ্ছনা আর নয়।

গোবিন্দর কানের উপরে মুখ এনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কু দিচ্ছে। কণ্ঠ দিয়ে সূঁচ ফোটায় যেন কানের গর্ভে। তারই মধ্যে একবার বলে নেয়, এতক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছ। ঘুমুবে না আর এখন। জাগ, জাগ, জাগতে হবে—না জাগিয়ে ছাড়ব না।

গোবিন্দ সজোরে ঝাঁকি মারে, রাধারাণী গড়িয়ে পড়ে একদিকে। মানুষটার গায়ে শক্তি আছে। বলে, বড্ড জ্বালাতন করছ। বাইরে থেকে ওরা সব লুকিয়ে দেখছে। ছি-ছি!

পে'চা তো নয়, এই আঁধারে দেখবে কি করে? আমিই বলে দেখতে পাচ্ছি নে তোমায়, তার ওরা দেখবে!

নাঃ, বড় বেহায়া তুমি! লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছ। বাজারের মেয়েমানুষও এতদূর করে না।

কিন্তু রাগ করবে না কিছুতে রাধারাণী। অপর্ণা শিখিয়ে দিয়েছে। রাগ হলেও ঠোঁটে আসবে না রাগের কোন কথা। অপর্ণা পাখি-পড়ান পড়িয়েছে।

রাধি নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, বাজারের মেয়েমানুষ নই বলেই তো করতে পারছি ঃ লজ্জার সম্পর্ক কি তোমার সঙ্গে? লজ্জা বলে কি, নিন্দা-ঘৃণা মান-অপমানের সম্পর্কও নয়। মন্ত্র-পড়া পাকা গাঁথুনির সম্পর্ক আমাদের।

আবার বলে, আরও তো বিয়ে করেছিলে। দু-দু'বার। বিয়ে না-করা পরিবারও বাসুদেবপুরে আছে, শুনতে পাই। তারা কি করে, তাদের গল্প বলতো শুনি।

শেষ কথাটা—বাসুদেবপুরের কথা—কানে গিয়ে পুরুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেঃ কক্ষণো নয়। ওই সব মিথ্যা অপবাদ কে রটায়?

আমিও বলি, রটনা মিথ্যা। যারা রটায় তাদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করব। এই ক'দিনের বিয়ের বউ হয়ে বলছি, আর যা-ই হোক ও-দোষ তোমার থাকতে পারে না।

নিঃশব্দতা বেশ খানিকক্ষণ। হঠাৎ একসময় গোবিন্দ আত্মগতভাবে বলে ওঠে, কী গরম! ঘাম পড়ছে দরদর করে।

একপ্রান্তে রাধি পাথর হয়ে বসেছিল। হেসে ওঠে ঃ পুকুর-ঘাটে ডুব দিতে যেও না কালকের মতো। ঘামের কথা বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে যায়। আমায় জিজ্ঞাসা করে, যা নয়—যা ঘটে নি, ঘটতে পারে না, তাই সব শোনায়। ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়েই আজ ঘাম মার।

এতক্ষণে এইবার বিষম রেগেছে গোবিন্দ। রাগের চোটে তিড়িং করে উঠে বসে। কাঁপছে। গলায় সেই ঝাঁঝঘণ্টা-বাজা আওয়াজ।

ইঃ, ভারি যে মুখ ফুটছে! ইটেভিটে ঘুচিয়ে তো মামার বাড়ি এসে উঠেছ। দু-সন্ধ্যে ভাত দিতে যাদের মুখ বেজার। কোন খবরটা জানি নে? বলি, এত জোর কে জোগাচ্ছে পিছন থেকে? অঙ্গের চিকন ছটায় কে মজল?

রাধি বলে, আমার মনের জোর। সত্যের জোর। গরিব বাপের মেয়ে হয়েও সেই জোরে গাঁয়ের মধ্যে ডঙ্কা মেরে বেড়িয়েছি।

নিজের মাথার বালিশটা ছুঁড়ে দিল ঘরের মেজেয়। মাদুর পেতে মেজের উপর শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করে শেষ রাত্রের দিকে রাধি একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। রোদ উঠে গেছে, ঘুমুচ্ছে পড়ে পড়ে তখনো। অপর্ণা এসে তুলে দিল। বলে, বড়দা চলে গেল। ঝগড়া হল বুঝি, ঝগড়া করে মেজের উপর শুয়েছ? পইপই করে তোমায় যে বলে দিলাম বউদি। আর বড়দা'রও কাণ্ড! ছেলেমানুষটি নয়—নতুন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়!

এক বাণ্ডিল নথিপত্র বগলে, মুরারি চটি ফটফট করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছে। শুনতে পেয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ঃ বড়ভাই হয়, কী

আর বলি! ওটা মানুষ নয়। মুক্তোর হারের কদর মানুষ হলে বুঝত। চুলোয় যাকগে। বলি, সম্পত্তির অংশ তো আমারও। আমার আর মায়ের দুই অংশ, আর ওর একটা। কিন্তু যা-সমস্ত শুনি, বাসুদেবপুর-মুখো হতে প্রবৃত্তি হয় না। দাঁতে-মিশি বিলাস দাসী মন টেনেছে। কাছি দিয়ে বেঁধে রাখলেও কাছি ছিঁড়ে ছুটে পালাত।

দুঃখের মধ্যেও রাধারাণীর হাসি পেয়ে গেল। না—না—না—শতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠতে চায়। মিথ্যে কলঙ্ক তার জিতেন্দ্রিয় স্বামীর নামে। হাজারো রকম অন্য বদনাম দাও, কিন্তু চরিত্র হারানোর আশঙ্কা নেই গোবিন্দর। এদিক দিয়ে রাধি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ।

অপর্ণা ভাইয়ের উপর ধমকে ওঠে ঃ মেয়েদের কথার মধ্যে তুমি কী জন্যে ছোড়দা? সেরেস্তায় যাচ্ছিলে, তাই যাও।

যেতে যেতে তবু মুরারি বলে, ভদ্রলোকের মেয়ে আমিই পছন্দ করে নিয়ে এসেছি এবাড়ি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বউঠান। কোনদিন আপনার কোন রকম অসুবিধা না হয়, আমি সে দায়িত্ব নিচ্ছি।

মুরারির কথাগুলো বড় ভাল লাগে, রাধারাণী ভরসা পায়। নতুন বউয়ের জ্বলজ্বলে রূপ দেখে মেয়েমহলে ঈর্ষা। সত্যি সত্যি আপন করে পেয়েছে বোধ করি এই অপর্ণাকেই শুধু। আর পুরুষের মধ্যে মুরারিকে। বিষয় সম্পত্তি পৈতৃক। গোবিন্দ কাছারি পড়ে থাকুক আর যা-ই করুক—সম্পত্তির অংশ, মুরারি ওই যা বলে গেল, তিন ভাগের এক ভাগ। কর্তা সেই মর্মে উইল করে দিয়ে গেছেন। এর উপরে মুরারির ওকালতির রোজগার। রীতি-মতো ভাল পয়সা রোজগার করে সে। মুরারির জন্যেই হালদারবাড়ির নামডাক ষোলআনা বজায় আছে। একান্ন-পরিবারে তার খাতির সেজন্য সকলের বেশি। তার কথার উপরে কথা নেই। সেই মানুষটি রাধির পক্ষে। তবে আর ভাবনা কিসের?

দিন দুয়েক পরে মুরারি অসময়ে সেরেস্তা ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে ভিতর-বাড়ি এল। বাসুদেবপুরের একজনের মুখে কথাটা শুনেছে। তারকেশ্বরীকে ডাকে ঃ ইদিকে এস মা, শুনে যাও ভাইয়ের কীর্তি।

রাধি ওধারের বারান্দায়, মুরারির সেজ সন্তান মণ্টু তার কোলে। স্বামী-দেবতা কোথায় আবার নতুন কোন কীর্তি করলেন—সরে এসে সে জানলার কাছে দাঁড়ায়। মুরারি বলে, ভাই তো ক্ষেপে গেছে একেবারে। বাড়ি এনে হাত-পা বেঁধে চোর-কুঠুরিতে চাবি দিয়ে রাখ, নয়তো পাগলা-গারদে পাঠাও। তা ছাড়া উপায় নেই। পূর্ণশশীকে মেরে বসেছে এবারে গিয়ে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তারকেশ্বরী আঁতকে ওঠেন ঃ পূর্ণশশী কবিরাজ?

তবে আর বলছি কি মা! বচসা হতে হতে ধাঁই করে গালে এক চড়।

অপর্ণাও এসে পড়েছে। সে বলে, কী নিয়ে বাধল—শুনেছ কিছু ছোড়দা?

জানলার আড়ালে রাধারাণী, মুরারি নিশ্চয় ঠাহর করেছে। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, তিলডাঙায় গিয়ে কনে পছন্দ করে ভাইকে বিয়ে করতে বলেছিল, সেই হল অপরাধ। রাজা-বাদশার ঘরে যে রত্ন মানায়, তাই তোর ভাগ্যে জুটেছে। তার জন্য কোথায় ধন্য-ধন্য করবি, তা নয় উল্টে গালি-গালাজ মারামারি।

পূর্ণশশী কবিরাজের তল্লাটজোড়া রোগিপত্তর—দুর্জন-সুজন কত যে তাঁবে ঘুরছে তার সীমাসংখ্যা নেই। ও মানুষ বিগড়ালে চক বাসুদেবপুরে প্রজা ঠেঙিয়ে আদায়পত্র করে খেতে হবে না, পাত্তাড়ি গুটাতে হবে দু-চার মাসের ভিতরেই। কবিরাজের সঙ্গে ভাব রেখে চলতে মুরারিই বলেছিল। এবং ভাব জমতে জমতে শেষটা এমন দাঁড়াল, দিনের মধ্যে ঘণ্টা দুই-তিন অন্তত একত্র বসে আড্ডা না দিলে ভাত হজম হত না—না গোবিন্দর, না পূর্ণশশীর। সেই ভাবের পরিণতি দাঁড়াল কিনা কাছারির বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে দুটো আধবুড়ো মানুষের গজ-কচ্ছপের লড়াই।

শতমুখে মুরারি গালমন্দ করে যাচ্ছে, কিন্তু রাধারাণীর কোন-কিছুই আর কানে ঢোকে না। কবিরাজ ঠেঙানোর আসল কারণ জানে না বলেই মুরারির অত ক্রোধ। কিন্তু রাধারাণীর বুঝতে বাকি নেই। কবিরাজি বটিকা ও অবলেহ দেখেছে সে গোবিন্দর ব্যাগের মধ্যে—খল-নুড়ি ও মধুর শিশি সুদ্ধ। দোষ বটেই তো পূর্ণশশী কবিরাজের—কী জন্য সে বিয়ের ব্যবস্থা দেয়! পোকামাকড়ের লুব্ধ অক্ষম সঞ্চরণ বলে ঘৃণা হয়েছিল সে রাত্রে। এখন ভাবতে পারছে, কবিরাজি ব্যবস্থারই পরীক্ষা সেটা। ভেবে লাঞ্ছনার জ্বালাটা যেন কমল।

গালিগালাজ করে মনের ঝাল মিটিয়ে মুরারি এক সময় বাইরের ঘরে সেরেস্তায় ফিরে গেল। আধেক চক্ষু বুজে মণ্টু কাদার মতন লেপটে আছে রাধির গায়ে। মণ্টুর ঠিক উপরের বোন মায়া। সে এসে নতুন-জ্যাঠাইমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। হাতে একমুঠো পাটকাঠি, হাতখানেক মাপে টুকরো-টুকরো করা। তাগিদ দিচ্ছেঃ চল না নতুন-জ্যাঠাইমা, তাড়াতাড়ি চল—

ছবি-বউ দেখে একগাল হেসে ফেললঃ কী কান্ত গো! চোঁ-চোঁ করে মণ্টু দুধের বাটি শেষ করে ফেলল, বাড়ির মানুষ টেরও পেল না। গুণ্ডা ছেলে একেবারে ভদ্রলোক। মায়াও দেখছি মাঠেঘাটে বনে-বাদাড়ে না ঘুরে বাড়ির মধ্যে ছাতের তলায়।

মন্তর জানি ছোড়-দি।

ঠিক তাই। বেঁচেছি বাবা ক'টা দিন। ভূত-প্রেতগুলো হাড় ভাজা-ভাজা করে দেয়। আমার দুটো-একটাকে কোলে-পিঠে তুমি মানুষ করে দাও ভাই। আর আমি পেরে উঠি নে।

ছবির কণ্ঠ করুণ হয়ে আসে। হেসে আবার একটু লঘু করে নেয় : মায়ের কাছে তো চলে যাচ্ছ। প্রথমবারে কদ্দিন আর থাকবে! কিন্তু এরই মধ্যে যা ন্যাওটা করে ফেলেছ, মণ্টু তোমায় খুঁজবে। এক কাজ কর—মণ্টুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। নয়তো মন্তরটা বলে যাও, ছেলে যাতে এইরকম ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

রাধারাণী বলে, মন্তর নয় ছোড়-দি। কলিযুগে মন্তরতন্তর খাটে না। ঘুস। দেদার ঘুস দিয়ে যাচ্ছি। বাখারিতে দড়ি বেঁধে ধনুক তৈরি করেছি; মায়ার হাতে এই যে পাটকাঠি—পাটকাঠির মাথায় কাদা চেপে তীর বানানো হবে। ধনুকে তীর ছুঁড়ে পরীক্ষা দিতে হবে তার পর। সুপারি-খোলায় বসিয়ে ছাতের উপর টেনে বেড়িয়েছি কাল সারাক্ষণ। মায়া ভারি কাজের মেয়ে, ও-ই সব জুটিয়ে এনে দেয়। ও না থাকলে হত না। পুতুল গড়ে দিয়েছি এঁটেল-মাটি দিয়ে। কাগজের নৌকো, কাগজের দোয়াত। তবে বোঝ, জ্যাঠাইমা ছেড়ে তোমাদের কাছে কোন লোভ যেতে যাবে? তোমরা তো এসব ভাল ভাল জিনিস দেবে না, খালি দুধ খেতে বলবে।

ধবধবে গায়ের রং ছবির, একফোঁটা মানুষটি। কিন্তু হাড়ের উপরেই চামড়া—মাঝে মাংসের প্রলেপ দিতে একেবারে ভুলে গেছেন বিধাতাপুরুষ। রক্ত-মাংসের অভাবেই বোধ করি তাকে অসম্ভব রকমের ফর্সা দেখায়।

সেই কথা উঠল। ছবি বলে, তোমার মতন না হোক, ছিল সমস্ত আমার ভাই। বিয়ের সময় ফটো তুলেছিল—আলমারির মধ্যে না কোথায় আছে—খুঁজেপেতে দেখিয়ে দেব তোমায়। মাংস-রক্ত সবই ছিল, কচি লাউয়ের মতো থুকথুকে শরীর। তা পেটের শত্তুরগুলো শুষে শুষে খেয়ে নিল সব। এ বন্যের জল থামেও না।

ষাট ষাট—করে ওঠে রাধি ঃ অমন করে বলে না ছোড়-দি। ছেলেপুলে মা-ষষ্ঠীর দান—সোনা হেন মুখ করে নিতে হয়। কত মেয়েছেলে আছে, মাথা কুটে কুটে একটা সন্তান পায় না।

সেই তো বলি। ষষ্ঠীঠাকরুনের দয়ার শেষ নেই। মণ্টুর পরে ঝণ্টু—তার এই সবে দাঁত উঠবার মতন। এরই মধ্যে আবার একটি—মাঘ মাস লাগাত কোলে এসে যাবে। নিজে মরি সুতিকার অসুখে, তার ভিতরে পালা করে একবার শোবার ঘর একবার আঁতুড়ঘর চলছে।

রাধারাণী বলে, এবারের আঁতুড়ঘরের জন্য ভেব না ছোড়-দি। আমি আছি। মণ্টুকে এই দেখছ। তোমার ঝণ্টুকেও দু-এক মাসের ভিতরে এমন

করে নেব, মায়ের কোল ফেলে সে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাচ্চা ছেলেপুলে বশ করতে আমার জুড়ি নেই। বড্ড ভাল লাগে তাদের। বাচ্চা কোলে নিয়ে আমি সব ভুলতে পারি। ছোট্ট বয়স থেকে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতাম এর ওর ছেলেমেয়ে কোলে করবার লোভে। মা তাই নিয়ে কত গালিগালাজ করত।

ছবি বলে, তুমি এসেছ—ক'দিন তাই হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। নাড়াচাড়া কর ভাই আমার ওগুলোকে, নিজের পেটে যদ্দিন না আসছে। সে আর কত? এক বছর, না হয় দু-বছর। আমার তো জনম ভোর এই চলবে। সে আমি জেনে বসে আছি। মরণ না হলে আমায় ছাড়বে না।

সকৌতুকে রাধি ঘাড় দোলায়। এক বছর, না হয় দু-বছর—তাই বটে! এক-শ' বছর দু-শ' বছর বরের সঙ্গে যদি ঘর করে, তবু সে বাচ্চা দেবে না। বড় কঞ্জুষ বর।

মক্কেলের কাজকর্ম সেরে খানিক রাত্রে মুরারি ভিতর-বাড়ি এল। মুরারির মা তারকেশ্বরী গোবিন্দর সৎমা—বুড়োমানুষ সন্ধ্যার অনতিপরেই ঘুমিয়ে পড়েন। শাশুড়ির কাছে বসে রাধারাণী মণ্টুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। ঘুমিয়ে ছিল মণ্টু, কী জানি হঠাৎ কেন জেগে পড়েছে। ছবি আর অপর্ণা রান্নাঘরে।

দরজায় ছায়া দেখে রাধি তাড়াতাড়ি উঠতে যায়। মুরারি বলে, উঠতে হবে না বউঠান। দেখছিলাম আমি। মণ্টুর আপনি তো মায়ের চেয়ে বেশি হয়েছেন। সেই যা সেদিন বলেছি—কোনরকম দুর্ভাবনা করবেন না। বড়ভাই হলে কি হবে, বংশের কুলাঙ্গার ওটা। গোবরে পদ্মফুল ফুটেছিল, তার মহিমা বুঝল না। বাসুদেবপুর গিয়ে আছে—সে সম্পত্তি আমাদেরও। আমরা কিছু নিতে খেতে যাই নে। ভাইয়ের গলগ্রহ না হয়ে ওই সম্পত্তির একটা অংশ যাতে আপনি পান, সেই ব্যবস্থা করব। আর কিছু গয়না আছে আপনার শাশুড়ির গায়ের। সেটা সম্পূর্ণ আপনার, ছবির তাতে অংশ নেই।

বকবক করে অনেক ভাল ভাল কথা শুনিয়ে মুরারি গিয়ে খেতে বসল। রাধারাণী মৃদু হাতে থাবা দিচ্ছিল মণ্টুর কপালে। মুরারির কথা শুনতে শুনতে হাত থেমে গিয়েছিল এক সময়। আবদেরে ছেলে অমনি উম-হুম করে পাশমোড়া দেয়। আবার দ্রুত থাবা দিচ্ছে......

এত খুশি কেন ঠাকুরপো তার উপরে? মণ্টুর আদর-যত্ন দেখে? ছবি-দিদি পেরে ওঠে না। ঢিলে স্বভাবের মানুষ, শরীরের গতিক ওই—বড় হেনস্থা ওর ছেলেপুলের। কে কবে এমন বুকের মধ্যে নিয়ে মণ্টুকে ঘুম পাড়িয়েছে! বাচ্চা ছেলের আরাম ও সমাদর দেখে বাপের প্রাণে আনন্দ। গোবিন্দ পড়ে থাকুক বাসুদেবপুরে। অথবা যে চুলোয় ইচ্ছে থাকুক। বরের

সঙ্গে শোওয়া ছাড়াও জীবন আছে। বিধবা হয়েও মেয়েমানুষ পরমানন্দে সংসারধর্ম করে। মণ্টু রাধির হাত ধরেছে, মায়া আঁচল টানছে, কোলে ঝণ্টু—আর আসন্ন ওই সর্বশেষের বাচ্চাটি ছবি-দিদির গর্ভ থেকে সোজা একেবারে রাধির বুকের উপর। রাজেন্দ্রাণী রাধারাণী! দেবী-দশভুজার ডাইনে বাঁয়ে ছেলে-মেয়ে, উপর থেকে চালচিত্রের দেবতা-গোঁসাইরা উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে মহা-মায়ার গরব দেখছেন—সেই প্রতিমাখানি বুঝি রাধিরই।

ক'দিন পরে আবার রাধির প্রসঙ্গ উঠেছে। তারকেশ্বরী বলছেন মুরারিকে ঃ বুধবারে ওদের তো জোড়ে পাঠানোর কথা ছিল। দ্বিরাগমন। গোবিন্দ সরে পড়ল। বড়-বউমা একলাই তবে যাক। আর উপায় কী?

মুরারি বলে, না গেলেই বা কী! বাপের বাড়ি নয়, মামার বাড়ি। সে মামা আমারই মক্কেল—অনেকদিন থেকে জানি। বোন-ভাগনী কাঁধের উপর নেহাৎ চেপে এসে পড়ল—কী করবে! দায় উদ্ধার করে দিয়েছি, মামা এখন ভাগনীতে চিনতে পারবে বলে তো মনে হয় না।

তারকেশ্বরী বলেন, কিন্তু মা আছেন যে। বড্ড মিনতি করে বেহান আমায় চিঠি দিয়েছেন। মেয়ে পাত্রস্থ হয়েছে, কাশীবাসী হবেন এইবার। পেটমোছা কোলমোছা ওই মেয়ে—যাবার আগে একমাস দু-মাস একসঙ্গে থেকে যাবেন। এমন অবস্থায় 'না' বলা ঠিক হবে না।

মুরারি জবাব দেয় না, ভাবছে। তারকেশ্বরী বলতে লাগলেন, আমাদের এখানেই বা কী এখন! মেয়েরা ছিল এদ্দিন, হাসিখুশিতে কেটেছে। এক অপর্ণা—সে-ও পরশু চলে যাচ্ছে। নতুন এসেছে তো, আমি বলি, ঘুরে আসুক কয়েকটা দিন। মা চলে গেলে আর হয়তো কখনো যাওয়া ঘটবে না।

তবু যেন মুরারির ইতস্তত ভাব। অপর্ণা এসে পড়ল কথার মধ্যে। আর অপর্ণা যখন—পিছন দিকে অদূরে কপাটের অন্তরালে রাধারাণীও কি নেই? দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মুরারি বলে, তা বেশ তো। তোমার বাড়ির বউ, তুমি যা করবে তাই হবে। তবু একবার জিজ্ঞাসা কর বউঠানকে। তিনি কি বলেন। মণ্টু আর মায়াকে ছেড়ে থাকতে পারবেন তো তিনি?

অপর্ণা বলে, বউঠান বউঠান কর কেন ছোড়দা? শুনে গা ঘিনঘিন করে। মনে হয়, কোন সেকেলে বুড়োহাবড়া দিদিমা।

মুরারি হেসে বলে, কি বলব তবে? বড় ভাইয়ের স্ত্রী তো বটেন! কেউটেসাপ ছোট হলেও বিষ কিছু কম থাকে না। সম্পর্কে বড়—পূজনীয়া। বউদি ডাক মুখে আসে না, বয়সে বড্ড ছোট। ভাসুরের মতন দেওর আমি। আমার বয়সটা কিছু কম হলে বউদি বলে ডাকতে পারতাম।

অপর্ণা বলে, ভাসুরেও তো কত আজকাল ভাদ্দরবউয়ের নাম ধরে ডাকে। রাধারাণী না হল, রাণী বলে ডাকতে পার।

তারকেশ্বরী ধমক দিয়ে ওঠেন ঃ আধিক্যেতা! বড় ভাজের নাম ধরে ডাকবে! মুরারি আমার সে রকমের নয়। বউঠান বলছে, ওই বেশ ভাল। যা তুই।

রাধি শুনছে। ভাবে, সকল রকম বিবেচনা মানুষটির। গুণ না থাকলে বড় হয়! এই বয়সে এমন পশার। মানুষটা সকল দিক সামলে রেখেছে। এই বিশাল সংসার একটা মানুষের কথায় চলে।

= সাত =

মাত্র কয়েকটা দিনের পর রাধি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, তিলডাঙা মামার বাড়ির এবারে ভিন্ন চেহারা। বাপ মরার পরে প্রথম এসে যেমনটা দেখেছিল। শান্তিবালা এসে জড়িয়ে ধরলেন। তেমনি আন্তরিকতা-ভরা আদর-যত্ন। রাধি বিবাহিত এখন, আরতির বিয়ের আর সে বাধা নয়। সর্বাঙ্গে গয়নাগাঁটি, রূপ আরও যেন সহস্র গুণ হয়েছে।

রাধি বলে, আমার আসল শাশুড়ি তো নেই, তাঁর গয়না এই সব। আমি রেখে আসছিলাম। গাঁ-ঘরে এত সোনা পরে বেড়ানো ঠিক নয়। দেওর কিছুতে শুনলেন না। সমস্তগুলো পরে তবে আসতে দিলেন।

এই কথা নিয়ে শান্তিবালা পাড়া মাথায় করেন ঃ সোহাগি বউ কাকে বলে চেয়ে দেখ তোমরা। রাধারাণীকে পাড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে হাত তুলে কঙ্কণ দেখান, বাহুর অনন্ত দেখান। কাঁধের আঁচল সরিয়ে সীতাহার দেখান, কানের চুল সরিয়ে মাকড়ি দেখান। কোন গয়নায় কি পাথর বসানো, ধরে ধরে দেখিয়ে বেড়ান সমস্ত। এই এখন তাঁর দিনের বড় কাজ হয়েছে।

মনোরমা গাঢ়স্বরে বলেন, তোমাদেরই জন্য বউ। একেবারে নিখরচায় এরকম সম্বন্ধ ভাবতে পারতাম! দাদার উকিলবাড়ি, তাঁদের সঙ্গে কত দিনের দহরম-মহরম। তিনি জুটিয়ে আনলেন, তুমি আঁচলে কোমর বেঁধে লেগে গেলে, তবে হল। নয়তো নিঃস্ব বিধবা মানুষ আমার কী ক্ষমতা ছিল বল।

শান্তিবালা এক সময় রাধির মুখ তুলে ধরে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, জামাই কি বলে রে? মেয়ের সুখশান্তি জানবার জন্য মায়েরা পাগল হয়ে থাকে। নিজের মুখে বল্ তুই। লজ্জা কিসের? অন্যের কাছ থেকে মারফতি কথা শুনে সুখ হবে না।

শুনতে চাচ্ছেন এত আগ্রহ নিয়ে, তাঁদের রাধি বঞ্চিত করবে কেন? হেসে সে মুখ নিচু করে। বকবক করার চেয়ে ভাবভঙ্গিতে অনেক বেশি বলা হয়ে যায়। আনন্দে গলে গিয়ে শান্তিবালা বলেন, থাক থাক, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এল না কি জন্যে জামাই? শুনতে পেলাম, চকের কাছারি চলে গেছে।

রাধারাণী বলে, আসবার সমস্ত ঠিকঠাক মামিমা, চক থেকে হঠাৎ জরুরি খবর এল। বিষয়আশয়ের ব্যাপার সমস্ত ওই একজনের মুঠোয় তো! দেওর নিজের মক্কেল নিয়ে পাগল, ওদিককার কিছু দেখেন না। দেখবার দরকার হয় না, একজনেই তো করে আসছে সব। কাছারিটা পাকা বাড়ি—আমাকেও যেতে হবে নাকি। দোতলায় একটা নতুন ঘর তাড়াতাড়ি তুলে ফেলছে সেইজন্যে।

মনোরমাও শান্তিবালার মুখে শুনলেন। মেয়ের মাথায় হাত রেখে নিঃশব্দে আশীর্বাদ করেন তিনি। চোখে জল গড়াচ্ছে। মেয়ের এত সুখ মৃত্যুঞ্জয় চোখে দেখে যেতে পারলেন না।

জমে না কেবল আরতির সঙ্গে। রাধারাণীকে দেখলে সে পাশ কাটায়। যত শুনছে রাধির শ্বশুরবাড়ির গল্প, তত আরও মনমরা হয়ে পড়ছে। বিয়ে গাঁথল না এতদিনের মধ্যে। ইতিমধ্যে আবার এক জায়গা থেকে দেখে গেছে। যেমন বরাবর হয়ে আসছে—চিঠিতে খবর দেব বলে তারা সবে পড়েছে। বয়সে ছোট হয়ে রাধারাণীর ঘর-বর হল, সেই লজ্জা আজকে যেন রাধিরও।

মনোরমার কাশীযাত্রার গোছগাছ হচ্ছে, তারিখও ঠিক হয়েছে। ইহজন্মের দিন ফুরিয়ে এল, পরকালের চিন্তা এবারে। মৃত্যুঞ্জয়ের যৎসামান্য সঞ্চয় রাধির বিয়েয় লাগে নি, তীর্থবাসে খরচ হবে। মনোরমার এক খুড়তুত বোন থাকেন বাঙালিটোলায়। তিনিও বিধবা, অনেকদিন থেকে কাশীবাসী। দুই বোনে একত্র থাকবেন, স্নানান্তে শিবের মাথায় জল ঢেলে ঢেলে বেড়াবেন। তারপরে একদিন বাবা বিশ্বনাথ টেনে নেবেন পাদপদ্মের নিচে। মেয়ের সুখশান্তি হল—মনোরমার এখন তীর্থধর্ম ছাড়া অন্য সাধবাসনা নেই।

হঠাৎ এই সময়ে মোহিত আর সন্ধ্যা এসে পড়ল কলকাতা থেকে। কী আনন্দ, কী আনন্দ! ঠাকুর গোপাল মনোরমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখলেন না। যাবার আগে দেখা হল দাদার ছেলে-বউর সঙ্গে। কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে মোহিত বউ নিয়ে এসেছে। আপাতত চাকরি নেই। বিলাতি মার্চেণ্ট-অফিসের কাজ—ভারত স্বাধীন হচ্ছে, সেই আতঙ্কে এক দেশি কোম্পানিকে ব্যবসা বিক্রি করে তারা চলে গেল। নতুন কোম্পানি এখন বুঝসমঝ করছে, দরকার হলে পরে মোহিতকে ডাকবে। ডাকবে নিশ্চয়ই, তবে মাস পাঁচ-ছয়ের আগে আশা করা যায় না।

হারাণ বলেন, ডাকলেও যাবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে কি জন্যে পরের গোলামি করতে যাবে? কোন দুঃখে? সাতটা নয় পাঁচটা নয়, বাড়ির তুমি এক ছেলে! সারাজন্ম এক কড়া দু-কড়া করে যৎসামান্য কিছু করেছি। এখন থেকে দেখেশুনে না নিলে আমার চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নয়-ছয় হয়ে যাবে।

সে যাকগে। ডাক তো আসুক কোম্পানি থেকে, সে ভাবনা তখন। মনোরমাকে ডেকে একদিন মোহিত বলে, অতদূর কাশী কি জন্যে যাচ্ছ পিসিমা? ধর্ম কি এখানে থেকে হয় না? সেখানে খেয়েপরে বেঁচে থাকতে হবে, এখানেও। কাশী কি দুনিয়ার বাইরে?

মনোরমা বলেন, বাইরে বই কি বাবা। কাশী শিবের ত্রিশূলের উপর। যত-কিছু পাপ-অন্যায় বাবার পায়ে নামিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেড়াব। মরলে সঙ্গে সঙ্গে শিবত্ব-লাভ।

মোহিত চোখ টিপে হাসিমুখে বলে, ভিতরের কথাটা বল দিকি। বাবার সংসারের হিসাবি খাওয়া সহ্য করতে পারছ না। সেই কষ্টে সংসারে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ছ। উঁ?

শান্তিবালা লুফে নিয়ে বলেন, ঠিক। সত্যি কথা বলেছিস তুই। রাধির বাপ খাইয়ে-মানুষ ছিলেন। নিজে খেতেন, পর-অপর মানুষকে ধরে নিয়ে আকণ্ঠ খাওয়াতেন। এরাও চিরকাল ভাল খেয়েছে। দায় উদ্ধার হয়েছে, কী জন্যে তবে আর কষ্ট করবে? কাশী নাকি সেদিক দিয়েও বড্ড ভাল।

ইন্দুর মা তীর্থ করতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তিনি লম্বা-চওড়া গল্প ছাড়ছেন। তীর্থস্থান মাত্রেই ভাল, দেবতার খাস রাজ্যে আকাল ঢোকে না। সকলের সেরা এই কাশীধাম। দু-পয়সায় এই বড় ফুলকপি। চার পয়সা বেগুনের সের, দুধ চার আনা, ঘি দু-টাকা। গঙ্গার পোনামাছ ধড়ফড় করছে, ছ-আনা সেরে তাই বিকোয়। আরে ছি-ছি-ছি—বিধবা মানুষের খাওয়ার মধ্যে পোনা-মাছের কথা কী জন্যে এসে যায়!

সকলে মিলে স্টেশনে গিয়ে মনোরমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এল। সন্ধ্যা বউটা ভারি মিশুক, আরতির ঠিক উল্টো। গলায় গলায় ভাব জমেছে রাধারাণীর সঙ্গে।

সন্ধ্যা বলে, পিশিমা চলে গেলেন, আর তুমিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরমুখো ছুটবে, সে কিন্তু হবে না ভাই। বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে। দক্ষিণের ঘরে একা থাকতে পারবে না—তোমার ভাই থাকুকগে সেখানে। তুমি আর আমি দু-জনে পুবের কোঠায়। ভাইয়ের বদলে বোন।

কিন্তু ব্যবস্থা তার আগেই হয়ে গেছে। মোহিত এলে পুবের কোঠা ছেড়ে দিয়ে মনোরমা আর রাধি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে উঠেছিল। এবারে হারাণ নিজে দক্ষিণের ঘরে। রাধি মামির সঙ্গে মাঝের কোঠায় থাকবে।

সোহাগি বউয়ের উচ্ছল আনন্দময় সুরে রাধি বলে, ঘরের জন্য তো কিছু হচ্ছে না। কবে সমন এসে পড়ে দেখ! সেদিন কোন-কিছুতে মানাবে না। হিড়-হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। মা কাশী চলে যাচ্ছেন, সেই খাতিরে এদ্দিন কিছু বলে নি। আর শুনবে না।

সন্ধ্যা বলে, সমন যাতে না আসে, সেই ব্যবস্থা কর। জামাইবাবুকে লিখে দাও না, তিনি এসে ঘুরে যান কয়েকটা দিন। ক্ষিধে মিটবে, প্রাণ জুড়োবে, কিছুদিনের মতো আর টান থাকবে না।

রাধি অন্তরঙ্গভাবে গায়ের উপর এসে বলে, সত্যি কথা বলি তবে বউদি। টানছে আমায় মণ্টু আর মায়া। ছেলেটা আর মেয়েটা এমন করত—সময় সময় মনে হয়, পাখি হয়ে উড়ে গিয়ে একবার তাদের কোলে-কাঁখে করে আসি।

সন্ধ্যা খিলখিল করে হাসেঃ এ যে আসলের চেয়ে সুদের দাম বেশি হয়ে গেল ভাই। নিজের কোলে আসুক, তখন আলাদা কথা। তত দিন ঝাড়া হাত-পা নিয়ে দিব্যি হেসেখেলে আমোদ করে বেড়াও। এই আমি যেমন আছি।

= আট =

সমন এসে গেল এরই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে। আগে ডাকের চিঠি এল, তারপরে এসে পড়লেন বিশ্বাসী প্রবীণ মুহুরি সুরেন বক্সী মশায়। ঝণ্টুর অন্নপ্রাশন। বিস্তর লোক জমবে। ছেলের মায়ের তো ওই অবস্থা। বার দুই-তিন উপর-নিচে করলেই বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘুরে পড়ে যায়। বাড়ির বড়বউ অতএব আগেভাগে গিয়ে আঁচলে ভাঁড়ারের চাবি বেঁধে সমস্ত গোছগাছ করবেন। বড়বাবু গোবিন্দও আসছেন। চক থেকে তিনি ভোজের মাছ কলাপাতা ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে আসবেন, বেশি আগে আসা তাই সম্ভব নয়। কাজের ঠিক আগের দিন এসে পৌঁছবেন।

অমলা অপর্ণা অণিমা তিন বোন এসে পড়েছে। আত্মীয়-কুটুম্ব আরও অনেক। উৎসবের বাড়ি গমগম করছে। বিনামেঘে বজ্রাঘাত। গোবিন্দ নৌকো বোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে আসছিল, সেই নৌকো বানচাল। বাসুদেবপুর থেকে অল্প দূরে দুই গাঙের মোহানায়। দাঁড়ি-মাঝি সবাই জল ঝাঁপিয়ে ডাঙায় উঠল, শুধু গোবিন্দ ভেসে গেছে কোথা। অথচ সাঁতার সে ভালই জানত। কাল পূর্ণ হলে কোন শিক্ষাই কাজে লাগে না—এ ছাড়া অন্য কি বলা যাবে?

একজন দাঁড়ি ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিল। রাত পোহালে এত বড় অনুষ্ঠান। যজ্ঞপণ্ড তো বটেই—অনেকের সঙ্গে মুরারিও বাসুদেবপুরে ছুটল। সেখান থেকে মোহানায়, দুর্ঘটনা যেখানে হয়েছে। দড়াজাল নিয়ে জেলে নামানো হয়েছিল আগেই। মৃতদেহ পাওয়া গেল না। শীতকালে গাঙের টান প্রখর নয়। তবু এত দূরে ভেসে গেছে অথবা কুমিরে-কামটে এমন বেমালুম খেয়ে ফেলেছে যে একখানা হাড়ের পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল না।

রাধারাণীকে জড়িয়ে ধরে অপর্ণা হাউ-হাউ করে কাঁদে। রাধারাণীর চোখে জল নেই, যেন সে পাথর। কী হল! নৌকো সত্যি সত্যি বানচাল, না কারসাজি শত্রুদের? ধুরন্ধর কবিরাজ পূর্ণশশীর কোন হাত আছে কিনা কে বলবে? কবিরাজের টাকা খেয়ে মাঝিমাল্লারা হয়তা কোন বিপজ্জনক দহের মধ্যে গোবিন্দকে আচমকা ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে পরে এই রকম রটিয়ে বেড়াচ্ছে। কত কী ভাবছে রাধি! হয়তো বা গোবিন্দ নিজেই মাঝিমাল্লাদের হাত করে নৌকো থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বউয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে সেই আতঙ্কে।

হঠাৎ এক সময় যেন সম্বিৎ পেয়ে রাধি অপর্ণার বাহুবেষ্টন ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে মণ্টুকে বুকে তুলে নেয়। মণ্টুকে ছেড়ে দিয়ে ঝণ্টুকে। ঝণ্টুকে নামিয়ে মায়াকে তুলে ধরে উঁচু করে। অশ্রুহীন শুষ্ক চোখে হাসছে যেন—

কেমন এক ধরনের হাসি। রাধারাণীর এই বৃত্তান্ত যার কানে যাচ্ছে, চোখ মুছে সে কূল পায় না। এই বয়স আর এমন আশ্চর্য রূপ—কিন্তু কী কপাল নিয়ে জন্মেছে রে হতভাগী!

গা ভরে গয়না দিয়ে সাজিয়েছিল, এক একখানা করে খুলে নিতে হল। মুরারি এর মধ্যে হাঁ-হাঁ করে এসে পড়েঃ গয়না সমস্ত খুলো না মা। হাতের বালাজোড়া অন্তত থাকতে দাও। সাদা থান পরিও না, কালাপেড়ে ধুতি পরুন। নইলে চোখ তুলে চাওয়া যাবে না বউঠানের দিকে।

মেয়েরা বাপের বাড়ি উৎসব করতে এসেছিল। কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল—বিদায় হয়ে গিয়ে বাঁচল যেন তারা। বাড়িটাই শ্মশানের মতো। শ্রাদ্ধশান্তি রাধারাণী করবে। অপঘাতে মৃত্যু, এর বিধিনিয়ম আলাদা—যেটুকু নিতান্ত নইলে নয় সেইভাবে অতি-সংক্ষেপে দায়সারা হল। মুরারি সান্ত্বনা দেয় মাঝে মাঝেঃ অমন ঝিম-ধরা কেন বউঠান? কী হয়েছে! ছবির অবস্থা জানেন—সংসারের সে কুটোগাছটা তুলে ধরতে পারে না। মণ্টু-ঝণ্টুর জ্যাঠাই-মা আপনিই এবার হাল ধরে বসুন। হালদার-বাড়ির সর্বময়ী আপনি। আমরা সকলে আপনার তাঁবেদার।

যথাসময়ে ছবি আঁতুড়ঘরে গেল। ঝণ্টুকে নিয়ে ভয় ছিল—তার জন্মের সময় যেমনটা হয়েছিল মণ্টুকে নিয়ে। কী কান্না, কী কান্না! ঝি-চাকর এবং বাপ মুরারি অবধি নাজেহাল। মায়ের কাছে যাবার জন্য কেঁদে কেঁদে শেষটা অসুখ করে গেল। এবারে একা রাধারাণীই সবগুলোকে সামলাচ্ছে, অন্য কাউকে লাগে না। বাড়িতে বাচ্চা ছেলেপুলে আছে কিনা বোঝাই যায় না। সন্ধ্যার পরেই রাধির এপাশে-ওপাশে তারা শুয়ে পড়ে।

মক্কেলের কাজ করতে করতে মুরারি সেদিন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। পেট চেপে ধরেছে। ভিতরে এসে রাধারাণীর ঘরের সামনে একটু দাঁড়ায়ঃ ঝণ্টু-মণ্টু ঘুমিয়েছে? মরে যাচ্ছি বউঠান, ফিকব্যথাটা আবার উঠেছে। একবার উঠতে পারেন যদি—বোতলে গরম জল ভরে আমার ঘরে দিয়ে যান। এই কাজগুলো ছবি বেশ পারে। কী যে যন্ত্রণা—ও—ও—ও—

কাতরাতে কাতরাতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অসুস্থ হয়েছে মানুষটা, এত কৈফিয়তের কি? রাধারাণী উঠে পড়ে জল গরম করে বোতলে ভরে নিয়ে গেল। মুরারি যন্ত্রণায় মুখ আকুঞ্চিত করে ও-ও—আওয়াজ করছে এক একবার। দেহ ধনুকের মতন বেঁকে উঠছে।

জলের বোতল হাতে রাধারাণী দাঁড়িয়ে আছে। এ মানুষ নিজের হাতে সেঁক দেবে কী করে? কষ্ট দেখে রাধির চোখে জল আসবার মতো। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, তবু মুরারি দেখতে পাচ্ছে না। দেখে তারপর টেনে টেনে বলছে,

এসে গেছেন? ফ্লানেলের টুকরোটা দিন আগে, ড্রয়ারে রাখা আছে। গরম বোতল গায়ের উপর রাখা যাবে না তো!

কম্বল একটা মুরারির গায়ে। বাঁ-হাতখানা বেরিয়ে রাধারাণীর হাত থেকে ফ্লানেল নিয়ে আবার কম্বলের তলে ঢুকে গেল। চোখ বুঁজে সহসা আর্তনাদ করে ওঠে। ব্যথাটা বড় চাগিয়ে উঠল বুঝি? খানিকটা সামলে নিয়ে আবার হাত বাড়িয়ে মুরারি মিনমিন করে বলে, দিন এবারে বোতল।

বোতল গেল কম্বলের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে বের করে বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল। রোগির পাশে দাঁড়িয়ে রাধি এখন কি করতে পারে ভেবে পায় না। বলে, কী হল?

মুরারি টেনে টেনে বলে, পারছি নে আমি। পেটের উপর ফ্লানেল রেখে বোতল গড়িয়ে দিচ্ছিলাম। হাত কাঁপছে কিনা। ফ্লানেল সরে গিয়ে খালি চামড়া পুড়ে গেল হয়তো।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই উকিল হাকিমের সামনে কথার ঝড় বইয়ে দেয়। মামা-হারাণ মজুমদারের মুখে রাধি অনেকবার এসব শুনেছে। সেই মানুষ কী রকম অসহায়! ক্ষীণস্বর কানে যায় কি না যায়!

মুরারি বলছে, ছবি নেই আর ব্যথাটা কিনা আজকেই উঠল। রোগের সেবায় ছবি বড় ভাল।

রাধারাণী মৃদু কণ্ঠে বলে, আমি চেষ্টা করে দেখব?

পারবেন আপনি? নাঃ, থাকগে। দেখুন, এমন কষ্ট—এখন যদি বিষ পাই তো খেয়ে নিই। এ যন্ত্রণার চেয়ে মরণ ভাল।

রোগি তো শিশুর শামিল। নয়তো এমন কথা বেরুচ্ছে মুরারি হেন মানুষের মুখ দিয়ে! মণ্টুর যদি এমনি হত, রাধি চুপ করে থাকতে পারত? বসে পড়ল রাধি রোগির পাশে।

ব্যথা কোনখানটা, দেখিয়ে দিন।

রাধারাণীর হাত ধরে মুরারি দেখিয়ে দেয়। নরম হাত ছাড়ছে না, এঁটে ধরেছে জোর করে। যন্ত্রণার আক্ষেপে হয়তো। সহসা বোতল কেড়ে ফেলে দিয়ে কঠিন মুঠিতে হাত ধরে যন্ত্রণার সমস্ত জায়গায় বুলিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে। পাথর হয়ে গেছে রাধি, বুক ঢিবঢিব করছে। কোথায় ফিকব্যথা? রোগি নয়, যেন মত্ত সিংহ। অভিনয় তবে সমস্ত? তিন মাস বিয়ের পরে আজও রাধি কুমারী। উঠে পালাবে সে শক্তিও নেই তার দেহে। শুধু একবার কেঁদে পড়েঃ আপনি যে আশ্রয় আমার—।

কাঁদছে রাধারাণী। বাঁধ-ভাঙা অশ্রুস্রোত। মুখে কথা নেই। আষ্টে-পিষ্টে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে সেই খাটের প্রান্তে। এ কী হল? ছবি যে

তার বোনের মতো। তাকে নিয়ে ছবির কত ভরসা। সেই ছবির উপরে বিশ্বাসঘাতকতা!

মুরারি ধমক দিয়ে ওঠেঃ কাঁদছ কেন, কী হয়েছে? নিচে চলে যাও। পুতুল হয়ে বসে থেক না, চোখ মোছ। রান্নাঘরের ওরা সব জিজ্ঞাসা করবে। ভাল করে মুছে ফেল। ছি-ছি, কী ন্যাকা মেয়েমানুষ তুমি! একটা কথা জেনে রাখ, তোমায় আমি ফেলব না কোনদিন।

রাধারাণী গুটিসুটি পা ফেলে নিচের তলায় নিজের ঘরে এল। যাবে না রান্নাঘরে, কারো সামনে যাবে না। বামুন-মাসি ডাকতে এসেছিল, খাবে না বলে দিয়েছে। অশুচি দেহ। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পচা ঘায়ের মতন থিকথিক করছে। জ্বলছে। কী করবে, কী এখন করতে পারে সে? উবু হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে মেজেয়। খাটের উপরে বিছানায় যেতে পারে না, মণ্টু-ঝণ্টু ঘুমুচ্ছে সেখানে। তাদের অকল্যাণ হবে।

স্বামীর উপর ভালবাসায় মন ভরে যায় হঠাৎ। কর্কশভাষী মানুষটা—অক্ষম অপদার্থ নির্বোধ। ফুলশয্যা ও তার পরের রাত্রি এক শয্যায় ছিল মানুষটার সঙ্গে। আর বাসর-রাতটাও যদি ধরতে হয়। তিনটি ব্যর্থ রাত্রি। তারই লজ্জায় যুবতী বউকে ঘুমন্ত ফেলে ঘোর থাকতে পালিয়ে গেল। চেহারাটা এরই মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে, অনেক ভেবে ভেবে একটু-আধটু মনে আসে।

কী ভেবে রাধারাণী পিছন-দরজাটা খুলে ফেলল, ফুলশয্যার রাত্রে গোবিন্দ যেমন খুলেছিল। খিড়কির ঘাটে গিয়ে মাথায় জল ঢালে। জল ঢেলে শীতল হয় না, জলে নেমে ডুব দেয়। ডুব দিল পাঁচটা-সাতটা দশটা—।

থাকবে না এ বাড়ি, থাকবার তো উপায় রাখছে না। ওই যে কাণ্ড হয়ে গেল, মুরারি ছোঁক-ছোঁক করে সেইদিন থেকে। মক্কেল ভাগিয়ে সকাল সকাল ভিতর-বাড়ি চলে আসে। মণ্টু-ঝণ্টু ঘুমিয়েছে, রাধিরও হয়তো ঘুমের আবিল এসেছে একটু। মুরারি পা টিপে টিপে এসে হাত ধরে টান দেয়। হেঁচকা টান—ডানা ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় বুঝি টানের চোটে। এস, চলে এস মুরারির ঘরে। নিরালা ঘর, ছবি এখনো আঁতুড়ে আটক পড়ে আছে। সবুর সয় না মুরারির, গড়িমসি করলে রেগে যায়। বড্ড মাথা ধরেছিল একদিন, তাতেও রেহাই হল না। সেই রাত্রির অপরাধের পর থেকে রাধির দেহটার উপর যেন মুরারির পুরো আধিপত্য।

একদিন ঝণ্টু ঘুমিয়েছে, মণ্টুটা চোখ পিটপিট করছে তখনো। তেমন চেষ্টা করলে কি আর ঘুমত না? রাধির চালাকিঃ থাকুক জেগে, বাচ্চা জেগে থাকায় একটা রাত্রি যদি মাপ হয়ে যায়।

মুরারি এসে পড়েছে। রাধি ফিসফিস করে বলে, ঘুমোয় নি। এই দেখুন—

আচ্ছা বিচ্ছু হয়েছে তো! কাল আফিঙের বড়ি এনে দেব, দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিও। অজ্ঞান হয়ে ঘুমুবে।

ষাট, ষাট! বাপ হয়ে এমন কথা বলতে পারে, মুখে আটকায় না। চলে যাবে রাধি যেদিকে দু-চোখ যায়। কিন্তু মণ্টু-ঝণ্টু এই যে দু-ভাই—দশভূজার কার্তিক-গণেশ। চলে গেলে কে তাদের খাওয়াবে? থাবা দিয়ে দিয়ে ঘুম পাড়াবে কে? তার উপরে আছে মায়া। জ্যাঠাইমা-জ্যাঠাইমা করে সারাদিন পায়ে পায়ে ঘোরে।

মতো মুরারি কিলবিল করে জড়িয়ে ধরে রাধির রক্তশোষণ করছে। কান্না পায়, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। খিড়কির ঘাটে গিয়ে অনেকগুলো ডুব দিয়ে এসে খাটে উঠে মণ্টুকে জড়িয়ে ধরে। শিশু কোলের মধ্যে নিয়ে সারাদেহ শীতল হয়। ঘুম আসে তখন।

= নয় =

দ্বিজপদ ঘুঘু লোক। হাটে হাটে কেনাবেচা করে। চারজন ভাগিদার। ভাড়া-করা এক ডিঙি আছে ওদের। কেশবপুর ডাঙা-অঞ্চলের হাট। এই শীতকালে খেজুরগুড় ওঠে প্রচুর, দামও সস্তা। সোমবারের হাটে গুড় কিনে ডিঙি বোঝাই করল। ওদিকে আবাদ-এলাকার হাট কাটাখালিতে ধান-চালের আমদানি; আবার ডাঙা-অঞ্চলের জিনিসের টান খুব সেখানে। বুধবার কাটা-খালির হাটে দ্বিজপদরা গুড় নিয়ে নামাল, কিনল ধান। এই কাজ-কারবার। দু-দশ টাকা যা মুনাফা হল, তাতেই খুশি। টাকা তো ঘুরছে অবিরত। আরও আছে। চিটেগুড় কিনে মাটি মেশাল দেয়, ধান-চালে চিটে আর কাঁকর। বাড়তি মুনাফা এই প্রক্রিয়ায়।

এক হাটবারে বেশি রাতে ঘরে ফিরল। মুনাফা ভাল হয়েছে, মনে স্ফূর্তি। হাটে মোরগ কিনে কেটেকুটে তৈরি করেছে ডিঙিতে বসে। চার ভাগিদার মিলে ফিস্টি হবে। কথা উঠল, এইসব খাসি-মোরগে চই দিলে জমে ভাল। চই একরকম লতানে গাছ, ঝাল-ঝাল স্বাদ, পানের মতন পাতা, দেয়াল অথবা মোটা গাছের গায়ে শিকড় বসিয়ে বসিয়ে লেপটে থাকে। হালদার-বাড়ির খিড়কির পাঁচিলে আছে একটা চইগাছ—খানিকটা ডাল কেটে আনলে হয়। এ আর কী এমন শক্ত—কাস্তে নিয়ে দ্বিজপদ বেরুল। পাঁচিলের এক জায়গায় খানিকটা ভেঙে গেছে গত বর্ষায়, এখনো মেরামত হয়ে ওঠে নি—সেইখানে উঠে বসে কাস্তে দিয়ে নরম হাতে পোঁচ দিচ্ছে। দালানে সেই দিককার একটা দরজা খুলে গেল হঠাৎ। শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্না। আড়াল নেই দ্বিজপদর কোনদিকে। এক্ষুণি তো দেখে ফেলবে। যে মানুষ বেরিয়ে এল দেখেই চেঁচাবে। তৈরি দ্বিজপদও। লাফ দিয়ে পড়বে ওপারে। দৌড়, দৌড়—তারপরে ঝুপ করে বসে পড়বে একটা ঝোপজঙ্গল দেখে। দেয় লাফ আর কি!

কিন্তু যে বেরুল, সে-ও আর এক চোর। মুখ দেখা না যায়, কেউ চিনতে না পারে—এমনিভাবে ঘাড় নিচু করে হনহন করে চলল। ঘুরে চলল বাইরে নয়—ভিতর দিকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির তলায়। যতই মুখ নামাক, দ্বিজপদ চিনেছে মানুষটাকে। মজাদার ব্যাপার বলে ঠেকছে—খুঁটিয়ে দেখতে হয় তবে তো! লাফটা পাঁচিলের ওধারে না দিয়ে এধারে দিল। যে ঘর থেকে মানুষটা বেরিয়ে এসেছে, উঁকিঝুঁকি দেয় সেখানে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাড়িতে তিনজন তারা গালিগালাজ করছে চই নিয়ে না ফেরার দরুন। আজকে থাকল এই অবধি, দেখতে হবে আর একদিন। চইগাছ ধরে টেনেহিঁচড়ে পাঁচিলের উপর উঠল। দিল লাফ ওপারে।

দিন তিনেক পরে কাটাখালির হাট থাকা সত্ত্বেও ঘাটে ডিঙি বাঁধা। হাট কামাই দিল আজ। ব্যাপারবাণিজ্য তো বারমাস আছে, এমন মজা ক'দিন পাওয়া যায়?

পাঁচিল টপকে এসে রাধারাণীর ঘরের পিছনে চারজনে তুমুল চেঁচাচ্ছেঃ চোর, চোর! ঘরের মধ্যে চোর ঢুকে পড়েছে।

চাকরবাকর সব বেরিয়েছে। সুরেন বক্সী মুহুরি মশায় উঠেছেন। চোরের নামে দু-চারজন পাড়ার মানুষও সদর ফটক দিয়ে ঢুকে পড়েছে। বুড়ি তারকেশ্বরী শীতের মধ্যে তুরতুর করে উঠে দোর ঝাঁকাচ্ছেনঃ বড় বউমা, ওঠ। চোর ঢুকেছে তোমার ঘরে।

আর দ্বিজপদ ওদিকে বিশদ ভাবে চোরের বৃত্তান্ত শোনাচ্ছেঃ আমাদের বাড়ি গিয়েছিল সিঁদ কাটতে। তাস-টাস খেলে চারজনে শুয়ে পড়েছি। গাঙে-খালে-ঘোরা মানুষ মশায়, চোখ বুজে ঘুমুই. কান দুটো ঠিক সজাগ থাকে। তাড়া করেছি তো পাঁই-পাঁই করে ছুটল। ছুটতে ছুটতে এই বাড়ি। ভাঙা পাঁচিলের ওই জায়গা দিয়ে তরতর করে উঠে পড়ল। আমরাও উঠছি। চোর লাফ দিয়ে পড়ল তো পিছন পিছন আমরাও। ভুল করে বোধ হয় কুঠুরির দোর দেওয়া হয় নি। ঘরে ঢুকে পড়ে চোর খিল এঁটে দিল। বাবুরা পাঁচিলটুকু কেন যে ভাঙা অবস্থায় রেখেছেন—

এমন ঝাঁকাঝাঁকি, দরজা খান-খান হয়ে পড়ে আর কি! মণ্টু জেগে উঠে ভয় পেয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদছে। রাধারাণী খিল খুলে দু-দিকে কবাট টেনে দিল। তারকেশ্বরী ঢুকলেন। পিছনে মুহুরি মশায় আর পাড়ার ইতরভদ্র যারা এসেছে।

ওরে মুরারি, তুই?

চোর কোথায়, আমাদের ছোটবাবু যে!

ছোটবাবু এখানে? কী সর্বনাশ!

উকিলবাবু যে! নমস্কার—

তারকেশ্বরী গর্জন করে ওঠেনঃ কালামুখি শতেকখোয়ারি, জলজ্যান্ত ভাতারটা চিবিয়ে খেয়ে এবার দেওরের ঘাড়ে লেগেছিস?

আর, কী আশ্চর্য—সারা বাড়ি এত হৈ চৈ, ছবি বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে উপরের ঘরে। আঁতুড়ের মেয়াদ শেষ করে ক'দিন হল ঘরে এসে উঠেছে। মুরারি অতএব নিজের ঘর ছেড়ে নিচের তলায় রাধির ঘরে আসে। একরকম চোখের উপরেই এত বড় কাণ্ড—ছবি-বউ কোন-কিছু জানে না। এমন হাবাগবা মেয়েমানুষ এই যুগে! কপালও সেইজন্যে পুড়ছে।

মুরারি এক ছুটে উপরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তবু কি ঘুম ভাঙে না ছবির? এবারে তারকেশ্বরী মুরারির উপর গর্জাচ্ছেনঃ ওই তো যত নষ্টের

গোড়া। দেখেশুনে পছন্দ করে কালসাপিনী ঘরে এনে তুলল। কুল-মান সবসুদ্ধ যায় এখন। লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রাখল না।

রাধারাণী স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। উঠে এবার পিছনের দরজা খোলে। দ্বিজপদর দলটা যেখানে। কাউকে সে গ্রাহ্য করল না, কোনদিকে তাকাল না। দুমদুম করে দৃপ্ত পা ফেলে সকলের চোখের উপর দিয়ে ঘাটে গেল। স্নান করল মাঘের নিশিরাত্রে। ভিজে কাপড় সপসপ করতে করতে ফিরে গেল ঘরের মধ্যে।

দ্বিজপদ ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে। মুরারি হালদারকে ধরিয়ে মজা করতে এসেছে তারা। হালদার-বাড়ির রূপবতী ভ্রষ্টা বউটাও স্নান করে ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে চোখের উপর দিয়ে এমনি বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে গেল, এটা উপরি লাভ।

সুরেন মুহুরিকে তারকেশ্বরী বলছেন, এ বাড়িতে আর তিলার্ধ নয় মুহুরি মশায়। পাপের আগুনে আমার সর্বস্ব যাবে। যা করবেন, এই রাত্রের মধ্যেই। পরামাণিক ডেকে মাথা ন্যাড়া করে দিন। ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে কুলো বাজাতে বাজাতে স্টেশনে নিয়ে ভোরের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসুন। যে চুলোয় ইচ্ছে চলে যাক। হাজার চুলো হাঁ করে আছে ওসব নষ্ট মেয়েমানুষের জন্য।

একটু পরে আবার হাঁক দিয়ে ওঠেনঃ কই গো, কে যাচ্ছে পরামাণিক-বাড়ি?

সুরেন বক্সী বিচক্ষণ মানুষ, স্বর্গীয় কর্তার আমল থেকে এবাড়ি আছেন। কেউ না শোনে, এমনি ভাবে মৃদুকণ্ঠে বললেন, ওসব সেকালে হত। এখন করতে যাবেন না মা। আইন খারাপ। বউমার মামা লোকটাও ফিচেল খুব। ভারি মামলাবাজ! ঘোল ঢালাঢালি করলে তো জুত পেয়ে যাবে, মোটা খেসারত আদায় করে ছাড়বে। যা-কিছু করবেন মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে খুব হিসাবপত্র করে। উকিলবাবুকেই বরঞ্চ একবার জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাক।

তারকেশ্বরী অবাক হয়ে বলেন, মুরারিকে জিজ্ঞাসা করতে যাবেন—সে কী বলবে?

প্রবীণ মুহুরি শতকণ্ঠে তারিপ করেনঃ না মা, আপনি জানেন না। ভারি সাফ মাথা আমাদের ছোটবাবুর। আইনের দিক দিয়ে বলুন আর সামাজিক মানমর্যাদার দিক দিয়ে বলুন, ভেবে-চিন্তে সবচেয়ে ভাল পথটাই উনি বাতলে দেবেন। দেখে আসছি তো! কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হবে না—শুধু দুটো-একটা পরামর্শ নেবার জন্য মুঠো-ভরা ফী নিয়ে সদর থেকে কত মানুষ ধন্না দিয়ে পড়ে। গুণ থাকলেই আসে। বলি উকিলের কিছু অভাব আছে সদরে?

তারকেশ্বরী ইতস্তত করছেনঃ সে তো ঠিক কথা। তবে কিনা বুঝতে

পারছেন বক্সী মশায়, আমার সুখের ঘর ভাঙবার জন্য শয়তানী কুহকিনী ফাঁদে নিয়ে আটকেছে—

হেসে হেসে ঘাড় নেড়ে সুরেন বলেন, কিছু না, কিছু না, ছোটবাবুকে আটকাবে সে মানুষ আজও জন্মে নি। ফাঁদে উনি ইচ্ছে করে ধরা দেন। ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসতে একটা মিনিটও লাগে না।

নিচুগলায় এমনি সব কথাবার্তা। ঘরের ভিতরে রাধির কানে যায় না। তারকেশ্বরীর হাঁকডাকগুলোই শুধু সে শুনতে পেয়েছে। শুনে বড় ভয় করে। মাথা ন্যাড়া করবে বলে—মেঘের মতন ঘন ঠাসা চুল পিঠ ছাড়িয়ে পড়ে, নাপিত এসে ক্ষুর চালাবে তার উপর। তাড়াতাড়ি সে দরজা এঁটে দেয়। জনতার মধ্য দিয়ে কুলো পিটিয়ে তাড়াবে, সেটায় তত ডরায় না। এমন রসের খবর সকাল হতে না হতে এমনিই তো মুখে-মুখে এদেশ সেদেশ ছড়িয়ে পড়বে। কুলোর আওয়াজ না হলেও লোকে দেখিয়ে দেখিয়ে তার কেচ্ছা বলাবলি করবে।

= দশ =

সকাল হল। বেশ বেলাও হয়েছে। মুরারির সঙ্গে সত্যি সত্যি পরামর্শ হয়েছিল কিনা, প্রকাশ নেই। কিন্তু তারকেশ্বরীর তড়পানি একেবারে বন্ধ। যেন কিছুই হয় নি—রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে একটা দুঃস্বপ্নে বুড়িমানুষ ওই রকম চেঁচামেচি করেছিলেন। চেঁচামেচির উত্তেজনার পর ঘুমুচ্ছেনই বোধ হয় ক্লান্তিতে। মুরারি শয্যা ছেড়ে দাঁতন ঘষে জিভছোলা দিয়ে সশব্দে জিভ পরিষ্কার করে যথানিয়ম কতকগুলো নথিপত্র নিয়ে হেলতে দুলতে বাইরের ঘরে গিয়ে বসেছে। চা চলে গেছে সেখানে এতক্ষণ। এবং মক্কেলও নিশ্চয় জমতে শুরু করেছে। রোজ যেমন হয়ে থাকে।

ভয়ে ভয়ে রাধি দরজা একটুখানি ফাঁক করে উঁকি দিয়ে চারিদিক দেখে নেয়। না, কোনদিকে কেউ নেই। তবু সে বাইরে যাচ্ছে না। কিছুতে নয়। হয়তো বা টুক করে ধরে নাপিতের সামনে বসিয়ে দিল। সে আতঙ্ক এখনো কাটে নি। মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল তাকে স্টেশনে......

দরজা ঠেলে এসে ঢুকল—ওমা আমার কি হবে—এ যে ছবি! কাঁদছে ছবি। কোথায় রাধি মুখ ঢাকবে, ভেবে পায় না। ছবি কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে। কাল রাতে সকলের সামনে এত লাঞ্ছনাতেও রাধারাণীর চোখে জল আসে নি, ছবির কান্নায় অপরাধী সে-ও এবার কেঁদে ভাসাল। রাধির চোখের জলে ছবির বুক ভাসছে, ছবির চোখের জলে রাধির মাথা।

রুদ্ধস্বরে রাধি বলে, বয়সে ছোট তবু সম্পর্কে বড়, সেজন্যে পায়ের ধুলো নিলে সেদিন। তার এই মান রাখলাম। জড়িয়ে ধরেছ কেন, পায়ের চটি খুলে মার আমায়। কেঁদে কেদে এত শাস্তি দিও না ভাই।

ছবি বলে, কাঁদছি ওই মণ্টু-ঝণ্টু-মায়ার কথা ভেবে। ওদের আর ছুঁতে পারবে না তুমি। শাশুড়ি বলে দিয়েছেন, ছুঁলে নোড়া দিয়ে হাত থেঁতো করে দেবেন তোমার। আমারই ভুলের জন্য এতদূর হল। তোমার হেনস্থার জন্য

অবাক হয়ে গেছে রাধারাণী। এ কোন কথা বলছে ছবি, তার দায়টা কিসে হল?

ছবি বলে, এতখানি বুঝতে পারি নি। ঘুমিয়ে পড়ে থাকি, শাশুড়ি বলেন। বাজে কথা, মিছে কথা। ঘুম আমার চোখে নেই। চোখ বুঁজে বুঁজে দেখি সমস্ত। দাঁতে দাঁত চেপে থাকি, প্রাণের যন্ত্রণা অন্যের কানে না যায়। উনি উঠে বেরিয়ে চলে যান—জানি নে জানি নে করে ঘুমই। সেবারে বিমলা ঝিয়ের

সঙ্গে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়ল। আমি কিন্তু তাতে সোয়াস্তি পাই। ভগবানের দয়া! থাকুক পড়ে ওই নেশা নিয়ে, আমায় খানিকটা রেহাই দিক। কিন্তু কদ্দিন আর একটা জায়গায়! ছুতো করে একদিন ঘাড় ধরে ঝিকে বাড়ির বার করে দিল। এমন আরও হয়েছে। তবু ভাবতে পারি নি ওই পাষন্ড বাড়ির বউয়ের সর্বনাশ করতেও পিছপাও নয়। তোমার ঘরে চলে যায়, জানলে আড় হয়ে পড়তাম। যা হবার আমার উপর দিয়েই হোক।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলে, গোড়া থেকেই ওর বদ মতলব। এখন বুঝতে পারি। বটঠাকুর কিছুতে বিয়ে করবেন না, ও একেবারে আদা-জল খেয়ে লাগল। নিজে বলল, মাকে দিয়ে বলাল। পূর্ণশশী কবিরাজের সঙ্গে বটঠাকুরের ভালবাসাবাসি—তাঁর কথার উপর কক্ষণো 'না' বলবেন না। সেই জন্য চক থেকে কবিরাজ মশায়কে খবর দিয়ে নিয়ে এল। ফুসফুস-গুজগুজ চলল দু-জনে, টাকা ঘুষ দিল কিনা জানি নে। তা-ও বিচিত্র নয়। তখন জানি, বড় ভাই উদাসীনের মতো চকের কাছারি পড়ে থাকেন, তাঁকে সংসারে টেনে আনছে। হায় আমার পোড়াকপাল!

শুনতে শুনতে রাধারাণী পাথর হয়ে যায়। ছবির দু-চোখে জল টলটল করছে। চোখ মুছে সে বলে, পতি পরম গুরু—বলতে নেই। কিন্তু ও যদি মরত, আমি হয়তো বাঁচতে পারতাম। এর উপর আবার একটা যদি আসে, আঁতুড়ঘর অবধি যেতে হবে না, তার আগেই চোখ উলটে পড়ব।

দুপুরবেলা পাথরের থালায় রাধির ভাত-তরকারি দিয়ে গেল। পাথরের থালা মরে না, মাজতে ঘষতে হয় না। দিয়ে গেল ঝি এসে, বামুন-মাসি হাতে করে দিল না। ঘরের সামনে রোয়াকের উপর ঠকাস করে রেখে গেল। রান্নাঘরে ঢোকা অতএব মানা। রান্নাঘরে যখন, ঠাকুরঘরে তো বটেই। অন্য কোন কোন জায়গায় সঠিক বলা যাচ্ছে না। সেই শঙ্কায় রাধি সারা দিনমানের মধ্যে একটি বার শুধু বেরিয়ে খিড়কি-পুকুরে ডুব দিয়ে এসেছে।

ভর সন্ধ্যায় উপরের বারান্ডায় মণ্টু গলা ফাটিয়ে কাঁদছে জ্যাঠাইমা-জ্যাঠাইমা করে। মায়ার বয়স হয়েছে, তাই শব্দ করে কাঁদে না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, আলো জ্বালবে কোন লজ্জায়? সেই অন্ধকারে রাধি উৎকর্ণ হয়ে বসে বাচ্চা ছেলের কান্না শোনে। আহা, একজন কেউ কোলে তুলে নিয়ে শান্ত করতে পারে না? সবাই কি কালা হয়ে গেল? ছবি নিজে তো অসুস্থ, সে পারবে না। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে মণ্টু আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়বে ঠান্ডা মেঝের উপর। সারা রাত্রি পড়ে থাকবে, বিছানায় তুলে শোয়াবার মানুষ হবে না।

ঘরের দরজা ফাঁক করে একজন ঢুকল অন্ধকারে। টিপিটিপি পা ফেলার ধরন দেখে বুঝেছে। কোর্ট থেকে ফিরে জলটল খেয়ে মুরারি এবারে বাইরে-বাড়ি যাচ্ছে। রাধিকে প্রবোধ দিতে এসেছে বোধ হয়। দুটো ভাল কথা বলবে, চোখের জল মুছিয়ে দেবে। তা নয়—টুক করে একখানা খাম ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত-পদে মুরারি বেরিয়ে চলে যায়।

জানলার ধারে গিয়ে একটা কবাট খুলে রাধি আঁটা খাম ছিঁড়ে ফেলল। কী লিখেছে না জানি! চিঠি নয়, এক বর্ণ লেখা নেই—দশ টাকার নোট তিনখানা।

হিসাব চুকিয়েবুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপার। বিমলা ঝিকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছিল—তারই রকমফের। রাধারাণীর মাথার মধ্যে চনচন করে ওঠে। ভয় হল—ব্রহ্মতালু জ্বলে গেছে, দুম করে মরে পড়ে যাবে এইবার। কিন্তু কিছুক্ষণ যে বাঁচার দরকার। মুরারির মুখোমুখি হবে বাইরে-বাড়ি গিয়ে। মক্কেলরা এসে থাকে, আরও ভাল—তাদের সামনেই বোঝাপড়া হবে।

সেরেস্তায় মক্কেল জমে নি এখনো। সুরেন মুহুরিও নেই, একলা নবকান্ত। খুব ধমকাচ্ছে মুরারি তাকেঃ রায়চৌধুরি মশায় আটটায় এসে পড়বেন। সারা সকাল বসে বসে রেহেনি-খতের মুশাবিদা করলাম, কাল রেজেস্ট্রি হবে। দোয়াতসুদ্ধ কালি ঢেলে তুমি তার উপর চিত্তির করে বসে

নবকান্ত বলে, আমি নই ছোড়-দা, বেরালে ঢেলেছে। আপনারই পোষা বেড়াল। তাকের উপরে শলা-ইঁদুর ঘুরছিল, তাড়া করেছে। সেই সময় দোয়াত উল্টে পড়ল।

কাগজপত্তর হাতবাক্সে কেন তুলে রাখ না? আমি জানি নে, কিচ্ছু জানতে চাই নে। এক্ষুণি সমস্ত নকল করে দিতে হবে, রায়চৌধুরি মশায় আসবার আগে।

বিপন্ন মুখে নবকান্ত বলে, চার ফর্দ, পুরো এপিঠ-ওপিঠ লেখা—

গর্জন করে উঠে মুরারি বলে, চাই আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে। মর আর বাঁচ, করে দিতে হবে। না পারবে তো পথ দেখ। অকর্মা পুষতে পারব না। ঢের মানুষ খোশামোদ করছে আমার এই সেরেস্তার কোণে একটু জায়গা পাবার জন্য।

রায় দিয়ে মুরারি টেবিলের উপর পা দুটো তুলে দিয়ে খবরের কাগজ টেনে নিল।

খসখস করে অতি-দ্রুত নবকান্তর কলম চলছে। কলম ফেলে তড়াক করে সে উঠে দাঁড়ায়।

মুরারি বিরক্ত হয়ে বলে, চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল—শরীর গরম না হলে হাত আর চলে না বুঝি? নবাব! ছুতো করে এবার চায়ের আড্ডায় গিয়ে বসবে।

জবাব না দিয়ে নবকান্ত সাঁ করে বাইরে চলে যায়। কাগজ থেকে চোখ তুলতেই টের পাওয়া গেল, কেন তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সে। রাধারাণী ঢুকছে। ভেবেছে কী ছোঁড়াটা! কাজের মানুষ মুরারি এখন এই সদরঘরে বউঠানের সঙ্গে বুঝি প্রেমালাপে বসে যাবে—সেই সুযোগ করে দিয়ে গেল?

খবরের কাগজে মুরারি পুনশ্চ গভীরভাবে নিবিষ্ট। রাধারাণী বলে, টাকা কেন দিয়ে এলে?

নোট তিনটে ছুঁড়ে দিল সে মুরারির মুখের উপর।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে মানুষ প্রথমটা যেমন কিছু বুঝে উঠতে পারে না, তেমনি নিরীহ দৃষ্টিতে মুরারি তাকাচ্ছেঃ অ্যাঁ—?

কিসের দাম দিয়ে এলে তাই জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যা নিয়েছ, টাকায় তার শোধ হয় না।

যেন ভারি একটা রসিকতার কথা, মুরারি এমনিভাবে টেনে টেনে হাসে। উকিলমানুষ, কথা বেচে খায়, মুখের আড় নেই। হাসি থামিয়ে বলল, দোকান খুলে প্রথম যে বউনির টাকা—কম হোক, বেশি হোক—কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখতে হয় বউঠান। বাণিজ্য ভাল জমে। টাকা অমন ছুঁড়ে দিও না, তুলে নিয়ে কপালে ঠেকাও।

জবাব শোনবার জন্য দাঁড়িয়ে নেই রাধারাণী, আগেই ছুটে বেরিয়েছে। ভিতর-বাড়ি থেকে একবার বাইরে এসেছে, আর ঢুকল না। চলল। কোথায় যাচ্ছে ঠিকঠিকানা নেই। বড়ঘরের বউ হয়ে ছিল, পথও জানা নেই এ জায়গার। শুধু এই মাত্র জানে, রাজশয্যা পেতে দিলেও হালদার-বাড়ি আর থাকতে পারবে না। সকলে দূরে দূরে থাকে, ভাতের থালা রোয়াকে এনে দিয়ে ঝি হয়তো স্নান করে, অথবা গায়ে তুলসির জল ছিটায় শাশুড়ির নির্দেশ মতো। সমস্ত সওয়া যায়। কিন্তু মণ্টু-ঝণ্টু কেঁদে খুন হচ্ছে, কানে শুনেও তাদের ছুঁতে পারবে না—এমন জায়গায় থাকে রাধি কেমন করে?

কনকনে শীত পড়েছে। সন্ধ্যারাত্রি হলেও মফস্বল শহরে যেন রাত দুপুর। পথে একটি মানুষ নেই। ছ্যাকড়া-গাড়ি একটা-দুটো কেবল মাঝে মাঝে। রাধারাণীর পক্ষে ভাল হয়েছে—ঘোমটা টেনে সে চলেছে। সর্বনেশে রূপটা কারো চোখে না পড়ে। হালদার-বাড়ির ভ্রষ্টা বউটা পথে বেরিয়েছে, কেউ টের না পায়। তা হলে শীত যতই পড়ুক, পথ এমনধারা ফাঁকা থাকবে না। এই কিছুদিন

আগে দুই-মাথাওয়ালা মানুষ এনেছিল এই শহরে—দু-পয়সা করে টিকিট। টের পেলে রাধারাণীকে দেখতেও তেমনি লোক জমে যাবে। ঘোমটার ভিতর দিয়ে এক-একবার রাধি এদিক-সেদিক মুখ ঘুরিয়ে দেখে। না, উঁকিঝুঁকি দেবার মানুষ নেই। যৌবন বয়সে পা দেবার পর এমন আরামের একলা যাওয়া কালেভদ্রে কদাচিৎ ঘটেছে।

হঠাৎ রাধি দাঁড়িয়ে পড়ে। সারি সারি টিনের চালা অদূরে। টেমির আলো জ্বলছে। হাটতলা—আন্দাজে বুঝেছে জায়গাটা। হাটের বার নয়, তবু শেষ রাত্রের কয়েক ঘণ্টা ছাড়া এ জায়গা কখনো নিশুতি হয় না। একটি-দুটি খদ্দের এখনো দোকানগুলোয়। পাশা খেলছে কোন ঘরে, প্রচণ্ড চিৎকার করে দান ফেলছে। মাটির ঢেলার উপর হাঁড়ি চাপিয়ে রান্না চাপিয়েছে একটা চালার নিচে—

ওরে বাবা! রাধি সাঁ করে ডাইনে ঘুরল। দ্রুত পা ফেলছে। কেমন এক আচ্ছন্ন ভাব—কোথায় যাবে, কি করবে, কিছুই বুঝতে পারে না। ছুটে পালাচ্ছে মানুষ দেখে, এই বোধটুকু শুধু আছে। মানুষে বড় ভয়। ফাঁকা জায়গায় এসে একটুখানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ঘরবাড়ি গাছপালা কিছুই নেই। আর খানিকটা এগুতে—ছলাৎ-ছলাৎ জলের তফরা পাড়ের উপর—সেই আওয়াজ কানে এল। গাঙের কিনারে এসে গেছে একেবারে। খেয়া পারাপার হচ্ছে, অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ পোড়া জায়গার মুখে লাথি মেরে পার হয়ে চলে যাবে। গাঙ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে—কোথায়?—অনেক দূরে কাশীধামে যেখানে মা রয়েছে। মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুক ছেড়ে খুব খানিকক্ষণ কেঁদে নেবে রাধারাণী। কেঁদে বাঁচবে।

তখন খেয়াল হল, পার হবে, কিম্বা কোনখানে চলে যাবে—একটা পয়সাও তো কাছে নেই। হঠাৎ কে বলে উঠল, গাঙের ধারে কেন?

রাধারাণী চমকে তাকায়। মানুষ পিছু নিয়েছে তবে তো! নবকান্ত মুহুরি।

নবকান্ত বলে, হালদার-বাড়ি ফিরবেন না সে জানি। ও নরককুণ্ডে যেতেও বলি নে। কিন্তু পাড়ের উপর থেকে সরে আসুন। মাটিতে ফাটল হয়ে থাকে, পাড় ভেঙে ভেঙে গাঙের মধ্যে পড়ে।

মুরারি হালদার মুহুরিকে ধরতে পাঠিয়েছে, তাই ভেবেছিল গোড়ায়। জলের দিকে আরও সরে যাচ্ছিল। দরদের কথা শুনে রাধারাণী পাষাণমূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে রইল।

নবকান্ত বলছে, মুশাবিদা নিয়ে আবার বসেছিলাম। মনটা খচখচ করতে লাগল। রাগের বশে একটা-কিছু না করে বসেন। ওদের কি—আপদ সরে গেলেই বাঁচে এখন। বেরিয়ে পড়লাম, রেগেমেগে ছোড়দা তো যাচ্ছেতাই করতে

লাগল। কেমন একটা মনে হল—সকলের আগে এই গাঙের দিকে ছুটেছি। ঠিক তাই, এইখানে আপনি।

রাধারাণী ঘাড় নেড়ে বলে, গাঙে ঝাঁপ দিয়ে মরতে আসি নি। পথ চিনতে না পেরে এসেছি।

কোথায় যেতে চান বলুন।

মায়ের কথাই বারম্বার আসে মনে। কিন্তু মনোরমা তো অনেক দূরের কাশীধামে—সে শুনি এ পৃথিবীর নয়, মহাদেবের ত্রিশূলের উপরে। আর রাধির বাবা—মৃত্যুঞ্জয়। তিনি আরও দূরের। নির্জন নদীকূলে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে রাধির দু-চোখ জলে ভরে যায়ঃ বাবা, তুমি এখন অন্তর্যামী, তুমি তো আকাশের তারা। সমস্ত জান, সব তুমি দেখেছ। আমার কোন দোষ নেই, সাধ্য ছিল না নিজেকে বাঁচাবার—

শুনতে পেল—নবকান্ত বলছে, তিলডাঙায় মামার বাড়ি চলে যান। আমি বলি, সেই ভাল। আপন লোক মজুমদার মশায়, তিনি কক্ষণো ফেলতে পারবেন না। স্টেশনে নিয়ে আমি গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।

রাধারাণী ইতস্তত করেঃ টিকিট কিনতে হবে তো—

নবকান্ত বলে, গরিব মানুষ আমি, মুহুরিগিরি করি, ছোড়দা'র খিঁচুনি খাই। তা হলেও টিকিটের দাম সিকে পাঁচেক—সেটুকু আমি পারব।

অদ্ভুত কণ্ঠ নবকান্তর। কান্নার মতো শোনাল।

স্টেশনে তখন ঘণ্টা দিয়েছে। রেললাইন ধরে তাকালে ইঞ্জিনের আলো দেখা যায় অনেক দূরে। টিকিট কেটে তাড়াতাড়ি দু-জনে প্লাটফরমের উপর এল।

কে-একজন চেনা মানুষ নবকান্তকে জিজ্ঞাসা করে, কাল তো কোর্ট রয়েছে। টিকিট কেটে কোথায় চললে এখন?

উকিলের মুহুরি—কত নয়কে হয় করতে হয়। গরজ মতন দুটো মিথ্যে বানিয়ে বলতে আটকাবে কেন মুখে? নবকান্ত জবাব দেয়, আমি যাচ্ছি নে। বোনকে তুলে দিতে এসেছি। এই যে জেনানা-কামরা, উঠে পড় এইখানে।

তার পরে, ছোট বোনের বিদায়ের সময় ঠিক যেমনধারা প্রবোধ দিতে হয়—

ভয় কিসের? নাম পড়ে স্টেশনে নেমে পড়বে। কত মানুষ—চেনা কেউ না-ই বা থাকল! খাসা ওয়েটিং-রুম আছে, দরজা বন্ধ করে রাতটুকু ইজিচেয়ারে পড়ে থেকো। থানা স্টেশনের লাগোয়া, পুলিসে সারারাত টহল দিয়ে বেড়ায়। আমি তো গিয়েছি ও-জায়গায়—সেই যে ছোড়দা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম।

রাধারাণী নবকান্তর দিকে তাকাল। কনে দেখতে গিয়েছিল—খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে ওরাই দেখেছে, রাধি চোখ নিচু করে ছিল বরাবর। আজকে দেখছে অবহেলিত দরিদ্র সেই পাত্রটিকে ভাল করে। গাড়িতে উঠে জানলার ধারে এসে বসল, তখনও দেখছে। স্টেশনের আবছা কেরোসিনের আলোয় মনে হল, নবকান্তর চোখ দুটো চকচক করছে। কলঙ্কিনী মেয়েটার জন্য চোখ মোছে—তা হলে আছে এমন মানুষ?

= এগার —
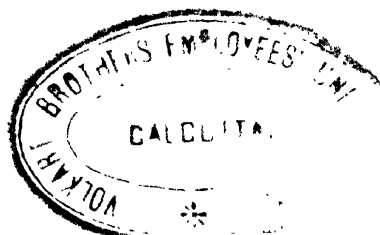
বাড়ির মধ্যে শান্তিবালা ওঠেন সকলের আগে। ভোরবেলা দরজা খুলেই দেখেন দক্ষিণের ঘরের পৈঠার উপর কাত হয়ে বসে একটা মেয়ে।

কে রে?

রাধারাণী মুখ ফেরাল। মুহূর্তকাল তাকিয়ে দেখে শান্তিবালা আর্তনাদ করে ওঠেনঃ ওরে মা, কাপড়চোপড় গয়নাগাটি পরে রাজরাণী হয়ে এলি সেবার, এ কোন ভিখারিণী আজ আমার উঠোনে!

কান্নাকাটিতে ঘুম ভেঙে সবাই বাইরে এল। সন্ধ্যা, আরতি, আরতির অন্য তিন বোন। মোহিত ওঠে নি—কলকাতার চাকরে বাবু—গায়ে রোদ না লাগলে ঘুম ভাঙে না। আর হারাণ বাড়ি নেই, কোর্টে মামলা, এই খানিকক্ষণ আগে রাত থাকতে রওনা হয়ে গেছেন।

সন্ধ্যা কেঁদে বলে, এমন ভাবে বসে কেন ভাই? ঘরে চল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধি বলে, না—

শান্তিবালা অবরুদ্ধ কণ্ঠে সান্ত্বনা দিচ্ছেনঃ বুকের মধ্যে দাউ-দাউ করে জ্বলে। বুঝি মা, বুঝি। আমার অজিত মা-শীতলার দয়ায় ছটফট করতে করতে চোখ বুজল। কতকালের কথা। আজও ভুলতে পারি নে। যে চলে গেল, তাকে ফেরানো যাবে না। তবু বাঁচতে হবে, সবই করতে হবে। তোর মা নেই এখানে, কিন্তু আমরা তো সব রয়েছি।

আরতি ইদানীং কথা একরকম বন্ধ করেছিল রাধির সঙ্গে। তারও চোখে জল। শুকনো চোখ শুধুমাত্র রাধারাণীর। একটা জায়গায় সেই থেকে এক-ভাবে বসে আছে। নড়েচড়ে না, চোখেও বোধ করি পলক নেই।

এরই মধ্যে একবার শান্তিবালা বলেন, তোর জিনিষপত্তর কোথায় রাধি? তুলেপেড়ে রাখুক।

কিছু নেই। যা পরে এসেছি, এই শুধু।

সন্ধ্যা আবার বলে, ঘরে এস ভাই। কাপড়টা বদলাবে। শাড়ি চলবে না—তা কাচা ধুতি আছে তোমার ভাইয়ের।

রাধারাণী ঘাড় নাড়ে। তেমনি বসে থাকে।

কিছু বিরক্ত হয়ে শান্তিবালা বলেন, এইখানে সমস্ত দিন কাটাবি নাকি? খাবি এখানে? শুবি এই জায়গায়?

রাধি বলে, খেতে দাও যদি, এখানে বসেই খাব। শোওয়া তো রাত্রিবেলা—অনেক দেরি, সেই সময় ভাবা যাবে।

কেমন এক ধরনের হাসি। ভয় হল শান্তিবালার, মাথা খারাপ হয়ে এল নাকি? জিজ্ঞাসা করেন, তোর সঙ্গে কে এসেছে?

কেউ না।

আরতি বলে, বাবাও এই খানিক আগে স্টেশনে চলে গেলেন। পথে দেখা হল না?

মামা তো গরুর-গাড়ি করে গাড়ির রাস্তায় গেছেন। আমি মাঠ ভেঙে পায়ে হেঁটে সোজাসুজি এসেছি।

এবারে কঠিন হয়ে শান্তিবালা বললেন, কী হয়েছে খুলে বল আমায়।

মামা যখন গেছেন, তাঁর মুখে শুনতে পাবে মামিমা। আমি বলতে পারব না।

বলে টালি-ছাওয়া সেই পৈঠার উপর আঁচল পেতে রাধি গড়িয়ে পড়ল।

সারাদিন এমনি কাটে। পৈঠার উপরে নয়, দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় উঠে বসেছে এক সময়। পাড়ায় রটনা, হারাণ মজুমদারের ভাগনি রাধি কী এক বিষম কাণ্ড করে এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে, তারা এক-কাপড়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। কত লোক দেখে গেল। জমিয়ে আলাপ করতে চায়, আলাপসালাপ করে ভিতরের কথা কিছু বের করবে—কিন্তু রাধির জবাব পায় না।

শান্তিবালা কাজের এক ফাঁকে আবার এসে পড়েন। রীতিমত ঝাঁঝালো সুর: বাইরে পড়ে থেকে আর কেলেঙ্কারি করিস নে। সংসার করতে হয় যে আমাদের, লোকের কাছে সর্বদা মুখ দেখাতে হয়। মুখ না খুলিস তো ঘরে ঢুকে মুখ লুকিয়ে থাক।

মায়ের বকুনি মোহিতের কানে গেছে। সে বলে, কেন জ্বালাতন কর? যেমন আছে পড়ে থাকতে দাও মা। মন খানিকটা ভাল হলে আপনি ঘরে যাবে। নিজের কাজে চলে যাও তুমি।

শান্তিবালা ছেলেকে ভয় করেন। ছেলের তাড়া খেয়ে ঘরে গেলেন, ত্রিসীমানায় আর নেই।

সন্ধ্যার পর হারাণ মহকুমা-শহর থেকে ফিরলেন। এসেই বললেন, রাধি এসেছে নাকি? কেন সব তোমরা ঘিরে দাঁড়িয়েছ, কী তোমাদের? চলে যাও। মোহিত আর মোহিতের মা থাকুক, তোমাদের শোনবার কিছু নয়।

সামনে থেকে সরে গিয়ে সন্ধ্যা ও মেয়েরা দরজার আড়ালে দাঁড়াল। হারাণ গিয়েছিলেন—এখন আর উকিল-বাড়ি নয়—কুটুম্বর বাড়ি। মুরারির সেরেস্তায় কাজ। কিন্তু এমন কুরুক্ষেত্তোর ব্যাপার, আগেভাগে কী করে বুঝবেন? রাধির শাশুড়ি একটি একটি করে সমস্ত বললেন। সুরেন মুহুরির সূত্রেও শুনে এসেছেন।

শান্তিবালা গালে হাত দিলেন ঃ কী সর্বনাশ গো, এমন কে কোথায় দেখেছে! কালামুখি কুল-মজানি—ভাল বলতে তো হবে তাদের, ঝাঁটার বাড়ি মেরে দূর করে দেয় নি। রাত দুপুরে নিজে বেরিয়ে চলে এল।

মোহিত এরই মধ্যে উল্টো কথা বলে, ঝাঁটা মারলে তো দু-জনকেই মারতে হয়। মুরারি হালদারটাকেও।

শান্তিবালা বলেন, যতই হোক পুরুষমানুষ সে—

মানুষটা লেখাপড়া জানে, বউ-ছেলেপুলে নিয়ে থাকে একই বাড়িতে। রাধি যদি ঝাঁটার এক বাড়ি খায়, সে খাবে তিনটে। কিন্তু আমি বলি মা, বিচারটা আপাতত মুলতুবি থাক। রাত দুপুরে শখ করে বেরিয়ে আসে নি, মামা-মামির কাছে জুড়োতে এসেছে। ক'দিন একটু শান্ত হতে দাও ওকে। প্রাণে বেঁচে থাকতে দাও।

আরতি দরজার আড়াল থেকে শুনে ছুটে গিয়েছে রাধির কাছে। হাত ধরে টানে ঃ সারা রাত বাইরে পড়ে থাকবে কেমন করে? ঘরের ভিতর যাও।

রাধি বলে, মামার কাছে শুনলে তো সব? ভাবছি, গোয়ালে গিয়ে শোব। ভগবতীরা আছেন, গোয়াল কখনো অশুচি হয় না।

থাক, খুব হয়েছে। ঘরে যাও বলছি। নয় তো দাদা ভীষণ রাগ করবে।

দাদা কিছু জানে না বুঝি?

জেনেশুনেই সে তোমার পক্ষে। কাউকে সে চুকে কথা বলে না। সবাই ভয় করে। তাই বলছি, ঘরে যাও।

দিন দশেক কাটল। কেলেঙ্কারির কথা ইতর-ভদ্র জানতে কারো বাকি নেই। তিলডাঙা গ্রামে শুধু নয়, চতুর্দিকে সারা অঞ্চল জুড়ে। যা ঘটেছে তার সহস্রগুণ রটনা। ভাল গৃহস্থঘরের আশ্চর্য রূপসী মেয়েটা যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, খাতায় নাম লিখে বাজারে বসাটাই বাকি এখন শুধু। পুরুষ-মেয়ে সবাই ছি-ছি করে। পারতপক্ষে রাধি ঘরের বার হয় না। কিন্তু মানুষের দেহ নিয়ে কখনোসখনো না বেরিয়ে তো উপায় নেই—পুরুষ কারো যদি সামনে পড়েছে, দুটো চোখ হুলের মতো ক্ষতবিক্ষত করবে তার সর্বদেহ, জিহ্বার মতো লেহন করবে, এক্স-রে রশ্মির মতো বসনের অন্তরালও রেহাই দেবে না। আর মেয়ে হলে তো কথাই নেই। মেয়েমানুষের দূরে দূরে ওৎ পেতে থাকতে হয় না, সমবেদনার অছিলা নিয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ে। দুটো চারটে কথার পরে মতলব আর গোপন থাকে না—মুরারির সঙ্গে সেই প্রথম রাত্রি এবং পরবর্তী রাত্রিগুলোর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শোনা। আরতিও যেখানে থাক এসে পড়বে এই সময়।

কী এক আক্রোশে পেয়ে বসেছে রাধিকে। কাউকে তাদের বঞ্চিত করে না। ভাল তোমরা সবাই, চরিত্রে একবিন্দু কালির দাগ নেই। উপযাচক হয়ে সঙ্গ দান করতে এসেছ, মূল্য দিতে হবে বইকি! ভূরি ভূরি সে মূল্য দিচ্ছে। শুধু একটি মুরারি হালদার নয়—আর অনেক জনকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে বলে। মেয়েগুলো মাতালের মতন গেলে। আশার অধিক পেয়ে খুশি হয়ে যায়। এবং বাড়ি গিয়ে হয়তো বা কেউ কেউ ছটফট করে সতীসাধ্বী হবার অনুশোচনায়। ফাঁক পেলেই নতুন-কিছু শোনবার জন্য আবার রাধির কাছে চলে আসে।

দক্ষিণের ঘরে একলা শোয় রাধি। ভয়ের কথা হয়ে দাঁড়াল—রাত্রিবেলা মানুষের আনাগোনা বাইরে। ছ্যাচাবাঁশের বেড়ার ঘর—বেড়া কেটে ঘরে ঢোকে যদি! মনোরমা কাশী চলে গেলে সে মাঝের কোঠায় মামির কাছে শুত, তখন হারাণ থাকতেন এই ঘরে। এবারে সে ব্যবস্থা নয়। পাপিনীকে কোঠাঘরে তুলতে যাবেন কি জন্যে?

ভয়ে রাধি ঘুমুতে পারে না। একদিন জ্যোৎস্নারাতে দেখল, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে—

কে, কে ওখানে? তুমি কে?

= বার =

পুবের কোঠায় ওদিকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিষম লেগে গেছে। সন্ধ্যা মারমুখী। বলে, আপদ কদ্দিন আর পুষবে বাড়িতে?

মোহিত বলে, যাবে কোথায় বল। মেনে নিলাম, রাধি ভুল করেছে। কিন্তু আমরা তাড়িয়ে দিলে আরও তো রসাতলের দিকে গড়াবে।

বাড়িতে লোক হাঁটাহাঁটি করছে, জান?

নিস্পৃহ কণ্ঠে মোহিত বলে, হতে পারে। মধুর গন্ধ পেলেই মৌমাছি আসবে।

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে সন্ধ্যা বলে, মধু নয়—পায়খানার ময়লা। আসে যত ময়লার মাছি।

মোহিত বলে, এক দিক দিয়ে ভাল। চারিদিকে চোরের উৎপাত। রাত্রে পাহারার কাজ হচ্ছে আমাদের বাড়ি। চোর ঢুকতে পারবে না।

সন্ধ্যা বলে, আসে যত লম্পট বদমায়েস—তারাই যদি চুরি করে? ভাল লোকে তো আসে না।

আসে না কে বলল? শীতকাল বলে আরও জুত হয়েছে। ভাল লোক মাথায় কম্ফর্টার জড়িয়ে আলোয়ানে মুখ ঢাকা দিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে।

হঠাৎ সন্ধ্যা কঠিন সুরে বলে ওঠে, সেই ভাল লোক একজন তুমিও। চোখ পাকিও না। চুরি করবে আবার চোখ পাকাবে, দুটো একসঙ্গে হবে না। মায়া বিষম উথলে উঠল, মায়ের কথার উপর চোপরা করলে—তখন থেকে জানতে কিছু বাকি নেই। রাত্রে রোজ তুমি বেরিয়ে যাও।

আমি?

তুমিই তো। ভাব, আমি কিছু টের পাই নে।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সব দেখে থাক। সন্দেহ-বাতিক ছাড় দিকি। কেন মিছে অশান্তি ডেকে আ৹

সন্ধ্যা বলে, দুয়োর আঁটবার সময় কাগজের টুকরো দিয়ে রেখেছিলাম দুই কপাটের ফাঁকে। সেই কাগজ সকালবেলা দেখি বাইরে পড়ে আছে। দুয়োর না খুললে কাগজ পড়তে পারে না।

এত প্রতাপ মোহিতের, কিন্তু স্ত্রীর কথার তোড়ে একেবারে মিইয়ে গেল। বলে, ছি-ছি, মাথা খারাপ তোমার। কী সব নোংরা কথা! কত নিকট-সম্পর্ক, আপন পিসতুত বোন হল রাধি—

বোন আগে ছিল। নষ্টদুষ্ট হয়ে গেলে পুরুষের সঙ্গে তখন একটাই শুধু সম্পর্ক। যে পুরুষই হোক—ওই। আজ আমি ছাড়ছি নে। আমার

আঁচলের সঙ্গে তোমার কোঁচার মুড়োয় গিঁঠ দিয়ে রাখব। গিঁঠ খুলে দেখি কেমন করে পালাও।

মরীয়া হয়ে উঠেছে। সত্যি সত্যি গিঁঠ বাঁধে সন্ধ্যা। গর্জাচ্ছে। দ্রুত নিশ্বাসে উঠানামা করছে বুক। বলে, বাজারে চলে যাক, বাজারে গিয়ে ঘর বাঁধুকগে। কটা রং আছে, ঢং আছে—সেই দেমাকে ভাবছে, বাজারে কেন যেতে যাব—যেখানে থাকি, সেইখানেই তো বাজার। সেটা হবে না গৃহস্থবাড়ির উপর থেকে। স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেব কাল। না যায় তো ঝাঁটাপেটা করব। যা ওর শ্বশুরবাড়িরা করে নি।

সকালবেলা উঠে অবশ্য রাগ অনেকখানি পড়েছে। রাধারাণীকে কিছু বলল না, কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে মোহিতের। কোন দিকে বেরিয়েছে তো শতেক রকমের জেরা ঃ কোথায় গিয়েছিলে ? ধাপ্পা দিও না, আমার চোখে ফাঁকি চলবে না।

কী জ্বালা, কাজেকর্মে বেরুনো যাবে না! পোস্টাপিসে গিয়েছিলাম একখানা চিঠি রেজেস্ট্রি করতে।

রাঁধি ঠাকরুনও ঠিক ঐ সময়টায় বেরুল কেন? কোন্ ঝোপজঙ্গলে গিয়েছিলে বল রাসলীলা করতে? বেশ, নিজে আমি পোস্ট-মাস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসব।

কিন্তু ঈশ্বর জানেন, একেবারে ভিত্তিহীন কুৎসা। রাত্রে একদিন দু-দিন বেরিয়েছিল অবশ্য মোহিত, বেড়ায় চোখও রেখেছিল। রাঁধি ওই সময়টা কি করে, সেইটে দেখে আসা—তা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নয়। কৌতূহল পুরুষের। কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে গেলে আরও সর্বনাশ, সোজা তাই বেকবুল যাচ্ছে। ঘরের বার না হয়েই দেখবে দিন কতক এবার। নিতান্ত বেরুবে তো একাকী কদাপি নয়—হারাণের সঙ্গে অথবা অন্য দু-চার জন সঙ্গী জুটিয়ে। অর্থাৎ সন্দেহাতীত সাক্ষ্যপ্রমাণ সহ।

কিন্তু না বেরিয়েও কি রক্ষা আছে!

দক্ষিণের ঘরের দিকে চেয়ে হাসাহাসি হচ্ছিল—আমি বুঝি দেখতে পাই নে, আমি কানা?

ঈশ্বর সাক্ষি, এই সময়টা মোহিতের দৃষ্টি ছিল দক্ষিণে নয়—সোজা উত্তরের দেয়ালের দিকে। কিন্তু শুনছে কে?

অবশেষে সন্ধ্যা শাশুড়ির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল ঃ আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন মা। চোখের উপরে অত শয়তানি দেখতে পারি নে।

শান্তিবালা বলেন, তুমি ঘরের লক্ষ্মী, তুমি কেন যাবে মা? বাইরের ঝঞ্ঝাট বিদেয় করে দিচ্ছি, রোসো।

সে তো পারবেন না মা। কিছুতে পারবেন না। খুঁটোর জোর আছে। ছেলে হয়ে মায়ের মুখের উপর হুমকি দিয়ে ওঠে, সেই তখনই টের পেয়েছি।

এমনি সময় সুরাহা হয়ে গেল। অদৃষ্ট ভাল মোহিতের। কলকাতায় জোর লেখালেখি করছিল—সেই কোম্পানি ডেকেছে আবার তাকে। মাইনে আগের চেয়ে কম। কিন্তু বিনি-মাইনেয়—এমন কি চাকরিটা না হলেও তো বাড়ি ছেড়ে কলকাতা বা যেখানে হোক গিয়ে পড়বার অবস্থা।

ছেলে-বউ চলে গেল। তখন শান্তিবালা হুংকার দিয়ে পড়লেন ঃ যাদের ঘরবাড়ি, তাদের বিদেয় করে দিয়ে এবারে অষ্ট অঙ্গ মেলে সুখ করবি ভেবেছিস? দূর হ।

কোথায় যাব, বলে দাও মামিমা।

যেখানে খুশি। আমি বলি, নরলোকে আর কালামুখ দেখাস নে। পুকুরে জল আছে, গোয়ালে গরুর দড়ি আছে। কিছু না হোক, ঘরের পাশে কলকেফুলের এত বড় গাছ—তার বীচি বেটে খেয়েও তো মরতে পারিস।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাধারাণী হারাণের কাছে চলে যায় ঃ মামি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন মামা—

হারাণ চুপ করে থাকেন।

মামি তো আত্মঘাতী হতে বলছেন। তা ছাড়া উপায়ও দেখি নে। তাই করব মামা?

হারাণ বলেন, মনোর মেয়ে তুই। কিন্তু কি করব, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিস তুই যে মা। আরতির বিয়ে ঝুলছে কাঁধের উপর, যামিনীটাও ধাঁ-ধাঁ করে সেয়ানা হচ্ছে। আরও দুটো তার পরে। পাড়াগাঁ জায়গা, সমাজ-সামাজিকতা রয়েছে। তুই বাড়িতে আছিস, তাই নিয়ে ঢি-ঢি পড়ে গেছে। কোন সম্বন্ধ এগোয় না, যেখানে যাচ্ছি মুখ ফেরায়। তোর মামি মনের ঝালে ওই সব বলেছে। কিন্তু আমাদের দিকটাও ভেবে দেখবি তো মা।

কথা একই—শান্তিবালার কথারই রকমফের। হারাণ মিষ্টি করে বলছেন বাড়ি ছেড়ে বিদায় হয়ে যেতে।

বললেন, শুধু হাতে যাস নে। কিছু দিয়ে দিচ্ছি। ভাল হয়ে থাকিস। মেয়ে ক'টার বিয়ে হয়ে যাক, আবার নিয়ে আসব। আনব না তো মনোর মেয়ে ফেলে দিতে পারি আমি? অনটনে পড়লে লিখবি, সাধ্যমতো কিছু কিছু পাঠাব।

শ্বশুরবাড়ির ঠাঁই গেছে, মামারবাড়ি থেকেও গেল। ফুটবলের তুলনা মনে আসে। এর পায়ের লাথি খেয়ে ওর পায়ে। সেখান থেকে আর এক পায়ে—। কিন্তু আর যে জায়গাটা মামি বাতলে দিলেন, সেটা রাধির মনে ধরে না। কেন মরবে? জন্ম নেবার পর কষ্ট করে এত বড়টা হয়েছে, অঙ্গ-বোঝাই এত রূপ

—মরলেই তো চুকে গেল। চিতায় পোড়াবে। আর পোড়ানোর কষ্ট না নিয়ে যদি গাঙে ফেলে দেয়, স্রোতে ভেসে ভেসে পচে গিয়ে দুর্গন্ধ হবে দেহ, কচ্ছপ-কামট-মাছে খুঁড়ে খাবে। শিয়ালে হয়তো টেনে তুলবে ডাঙায়, শকুনে ছেঁড়াছেঁড়ি করবে, লুব্ধ কাক গাছের ডালে উড়ে এসে বসবে একটুকু উচ্ছিষ্ট নাড়িভুঁড়ি পাবার আশায়। মা গো মা, সে বড় বিশ্রী। কিছুতে এসব হতে দেবে না। মরবে না রাধি, বেঁচে থাকবে। জলে ডুব দিয়ে গায়ের ময়লা ধোয়—তেমনি ডুব দিয়ে দিয়ে, ডুব দিয়ে দিয়ে সে কলঙ্কের কালি ধুয়ে সাফ-সাফাই করবে। সেই আগের মতন হবে সে আবার।

হারাণকে বলে, কাপাসদা গিয়ে থাকিগে মামা। আর কিছু না হোক, ঘর দু-খানা আছে, টুনিমণি আর তারাদিদি আছে। আর ঠাকুরবাড়ির গোপাল ঠাকুর আছেন। গোপালকে নিয়ে পড়ে থাকব দক্ষ-পিসিমার সঙ্গে। মানুষ বড্ড ছুঁচো, দরকার নেই আমার মানুষে।

= তের =

কাপাসদা এসে দিন কতক শান্তিতে কাটল। লোকে বরঞ্চ আহা-ওহো করে রাধির সম্পর্কে। এমন মেয়েটা, দেখ, যৌবনে-যোগিনী হয়ে ঠাকুরসেবা নিয়ে আছে। শুধু ঠাকুরসেবা কেন, গাঁয়ের লোকের বিপদ-আপদে—বিশেষ করে ছেলেপুলের রোগপীড়ায় সে বুক দিয়ে পড়ে খাটে। খাওয়া থাকে না, ঘুম থাকে না। শিয়রে বসে বাতাস করছে, তেষ্টা পেলে জল এগিয়ে দিচ্ছে—তাড়িয়ে দিলেও সেখান থেকে নড়বে না।

আধ-পাগলি তারা। একটা দিনরাত্রির মধ্যে ওলাওঠায় সাজানো সংসার পুড়েজ্বলে গেল। স্বামী কৈলাস গেল, টুনিমণির বর সতীশ গেল, টুনিমণির পিঠোপিঠি মেয়ে সোনামণিও গেল। কড়েরাঁড়ি টুনিমণিকে নিয়ে আছে। মাথা খারাপ সেই থেকে। অন্য কিছু নয়—বিড়বিড় করে বকে, আর সময় সময় ক্ষেপে উঠে শাপশাপান্ত করে ঠাকুর গোপালকে। তারা রান্নাঘরে গিয়ে উঠেছে—সেখানে পড়ে পড়ে আপন মনে যা খুশি বকুক। দেয়াল-দেওয়া বড় ঘরখানায় রাধি আর টুনিমণি। ভালই আছে।

ইস্কুলের সেকেন্ড পন্ডিত কাশীনাথ তর্কতীর্থের মেয়েটা পগার লাফাতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়েছে, পা মচকে গেছে। সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে পন্ডিতের। এন্ডিগেন্ডি কতকগুলো রেখে ব্রাহ্মণী অকালে গত হয়েছেন। যজনযাজন, তার উপরে ইস্কুলের চাকরি—কাশীনাথের নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। ছেলেপুলের কোনটা কোথায়, খোঁজই নিতে পারেন না। পগারের মধ্যে পড়ে মেয়েটা আর্তনাদ করছে। বছর আষ্টেকের মেয়ে। রাধি কোলে করে তুলে তর্কতীর্থের বাড়ি নিয়ে গেছে, আহত জায়গায় তেল মালিশ করছে। হঠাৎ কাশীনাথ আগুন হয়ে এসে পড়লেন ঃ শোন, এ-বাড়িতে এস না আর তুমি। মানা করে দিচ্ছি। যা হবার হোক বুলুর, খোঁড়া হয়ে বিছানায় পড়ে থাকুক—

মনে মনে রাধি ভয় পেয়ে যায়। কণ্ঠে লঘুস্বর এনে তবু বলে, কেন, হল কী বলুন তো? খারাপটা আমি কী করলাম?

তুমি নিজে খারাপ। ছোঁবে না আমার মেয়েকে। অস্পৃশ্যের অধম তুমি।

কাপাসদা গাঁয়েও খবর তবে এতদিনে এসে গেল! রসের কথা যে একবার শুনল, অন্যের কানে না দেওয়া পর্যন্ত কিছুতে সে সোয়াস্তি পায় না। এ-কান থেকে সে-কান করে বিশ ক্রোশ পথ পার হয়ে পৌঁচেছে খবর।

তর্কতীর্থ তো বাড়ি থেকে স্পষ্টাস্পষ্টি দূর করে দিলেন। আরও কতজনের মনে মনে কী আছে, কে জানে। কারো বাড়ি যাবে না রাধি, শুধু

এক ঠাকুরবাড়ি। গোপালের সেবা নিয়ে থাকবে। পাষাণের বিগ্রহ সম্পর্কে একটা সুবিধা, মুখ দিয়ে কোন-কিছু বলার উপায় নেই।

ঠাকুরবাড়ির পাঁচিলের বাইরে ফুলবাগান। পরদিন সকালবেলা রাধারাণী ফুল তুলছে। স্থলপদ্ম-গাছের কখনো ডাল ধরে টেনে, কখনো বা এক-পা উঠে ফুল তুলে তুলে ডালায় রাখছে। দক্ষ-পিসিমা আরও বুড়ো হয়েছেন. কোমর বেঁকে গেছে। কিন্তু পুজো সাজানোর কাজটা এখনো ষোলআনা তাঁর। অন্য কেউ করলে ভুলভ্রান্তি থেকে যায়, পুরুত খুঁত-খুঁত করেন। কী কাজে বাইরে এসে পিসিমা ফোকলা মুখে একগাল হেসে উঠলেন ঃ ওমা, শিউলি যে! শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে এলি, কিচ্ছু শুনি নি তো!

শেফালীরও বিয়েথাওয়া হয়ে গেছে, ছ-মাসের বাচ্চা কোলে। বাচ্চার কপালে সোনার পুঁটে, চোখে কাজল, হাতে বালা, পায়ে মল।

দক্ষনন্দিনী বলেন, ছেলে না মেয়ে?

ছেলে পিসিমা—

তা গয়নাগাঁটি পরিয়ে একেবারে মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন রে শিউলি?

শাশুড়ি এসব পরিয়ে দিলেন। তিন জায়ের মধ্যে কারো মেয়ে নেই, সবগুলো ছেলে। একটা মেয়ে হয়, বাড়িসুদ্ধ সকলের সাধ। দুধের স্বাদ ওরা ঘোলে মেটাচ্ছে।

নতুন মা শিউলি খিলখিল করে হেসে ওঠে।

পোড়া কপাল আমার! ছেলেকে ঘোল বলিস, আর মেয়ে হল দুধ! দূর, দূর—

খুব হাসছেন দক্ষনন্দিনী। এমনি সময় রাধিকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ আঁধার। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেনঃ ফুল তুলে তুলে কাঁড়ি করছিস কেন লা? পগারে ফেলে দে ও-ফুল।

তর্কতীর্থ টুলো পণ্ডিত, তার উপরে ভিন্ন পাড়ার মানুষ। তিনি আর দক্ষ-পিসিমা এক নন। সকল মেয়ের মধ্যে রাধিকেই বেশি ভালবাসতেন এই দক্ষ-পিসি। চিরকাল। ছোট্ট বয়সে কত কোলেকাঁখে করে নাচাতেন। সেই ভাবটা এখনো—কাল সন্ধ্যা অবধিও ছিল। সেই মানুষ মুখ কাল করে বললেন, ঠাকুরবাড়ি ঢুকবি নে আর কখনো। আমরা না জানি, তোর নিজের তো সব জানা। কোন আক্কেলে এদ্দিন ছোঁয়াছুয়ি করেছিস?

হল কি, বল তো পিসিমা? কোথা থেকে কী তুমি শুনে এলে—

পাপ আর পারা চাপা থাকে না, ফুটে বেরোয় একদিন না একদিন। হল তাই, কীর্তি ফাঁস হয়ে গেছে। তারার মেয়ে ওই যে টুনিমণি থাকে তোর সঙ্গে। কড়েরাঁড়ি—বর মরেছিল, তখন একেবারে একফোঁটা শিশু। তারপরে

এত বড়টা হয়েছে গাঁয়ের উপরে থেকে। কই, তার নামে তো কেউ কখনো বলতে পারল না।

হবার নয় বুঝতে পারছে, তবু হাসি-তামাশায় রাধারাণী উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে ঃ ঠাকুরবাড়ি না গিয়ে বাঁচব কেমন করে পিসিমা, ঠাকুরের সঙ্গে আমার যে আলাদা সম্পর্ক। তোমরাই বলতে গোপাল ঠাকুরের দুয়োর ধরে মা আমায় এনেছে।

হেসে উঠল সে ঃ ঠাকুর কোল খালি করে আমায় নাকি দিয়েছিলেন। রাধারাণী নাম সেইজন্যে। গোপালের সেবা না করে উপায় আছে আমার?

দক্ষনন্দিনী আরও কঠিন হয়ে বলেন, সে যখন ছিলি তখন ছিলি। এখন নরক। ঠাকুর চণ্ডালের হাতে পুজো নেবেন তো তোর হাতের নয়। পুরুত-ঠাকুর বলে পাঠিয়েছেন গোপালবাড়ির চৌকাঠ মাড়াবি নে তুই আর।

শেফালী এতক্ষণে একটি কথাও বলে নি। পরম আনন্দে শুনছিল। এইবারে বলে. দেখ পিসিমা, যার বড় খুঁতখুঁতানি তার শাকেই পোকা। কতটুকু বয়স আমার তখন, কী জানি আর কী বুঝি! হীরক-দা'র লাই পেয়ে কত কাণ্ড করল একটা চিঠি নিয়ে। ঝগড়ার চোটে গাঁ তোলপাড়। এখন? তল্লাট জুড়ে ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে। জানতে কারো বাকি নেই।

দক্ষনন্দিনী আবার ঠাকুরবাড়ি ঢুকে গেলেন। শেফালীও বক্রদৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পিসির পিছন পিছন চলল। একটা কথা চেপে গেল শেফালী—শুধু মুখের ঝগড়াই নয়, রাগের বশে থুতু ছুঁড়েছিল রাধি শেফালীর দিকে। এমনি দর্প ছিল সেদিন।

ডালা-ভরা ফুল নিয়ে ঠাকুরবাড়ির দরজার সামনে রাধি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে বলে, আমার কি দোষ বল ঠাকুর? ভাল থাকব, তা হলে এমন রূপ দিলে কেন? টুনির মতন কেন হলাম না? ছাতার কাপড়ের মতো কাল কটকটে গায়ের রং, ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে-আসা একজোড়া গজদন্ত? যে পুরুষ একবার তাকাল, দ্বিতীয়বার আর সে নজর তুলবে না। অন্য কিছু না হোক, গজদন্তে এফোঁড়-ওফোঁড় হবার আশঙ্কায়। অমন হলে আপনা থেকেই তো ভাল থাকা চলত ওই টুনির মতন।

বাড়ি ফিরছে পায়ে পায়ে। চোখের জলে বারম্বার বলে, আমি কি ভাল থাকতে চাই নি? এখনো চাই ভাল হতে। গৃহস্থঘরে সারাদিনের খাটা-খাটনির পর আরামের ঘুম—সেই ঘুম তো চেয়েছিলাম আমি ঠাকুর। ছোট্ট বয়স থেকে সেই আমার সাধ। মণ্টুর মতো তুলতুলে একটি ছেলে কোলের ভিতর, পাশে স্বামী—ঘুমের ঘোরে হাতখানা পড়েছে স্বামীর গায়ে......

বাড়ি এসে টুনিমণির কাছে কেঁদে বলে, শোন্ টুনি, কী নাকি কথা উঠেছে আমার নামে। ঠাকুরবাড়ি ঢুকতে মানা। কারো উঠোনে কেউ আমায় যেতে দেবে না। ফাঁকা বাড়ি, জীবন আমার কাটে কেমন করে?

বাড়ি ফাঁকা দিনের বেলাটাই। এবং খাওয়াদাওয়ায় রাত অবধি। তারপরে জমে ওঠে বাইরে। দেয়ালের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থেকেও সমস্ত টের পাওয়া যায়। পহরে পহরে শিয়াল ডেকে যত রাত বাড়ে, তত পাতার খড়খড়ানি, মানুষের পদশব্দ। তারা-পাগলি শুয়ে শুয়ে রাত্রি জাগে। তার মেয়ে টুনিমণির ঠিক উল্টো—শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম, যেন মরে ঘুমোয়। খাড়া দাঁড় করিয়ে দিলেও বোধ করি তার ঘুম ভাঙবে না। কড়েরাঁড়ি হওয়া সত্ত্বেও টুনির সতীত্বের উপর কখনো যে দাগ পড়েনি, চেহারা ছাড়াও এই নিশ্ছিদ্র ঘুম একটা কারণ। দরজার বাইরের অত আনাগোনা টুনি কিছুই টের পায় না। রাধির গা শিরশির করে সারারাত।

রাত থাকতে রাধারাণী উঠে পড়ে। উঠানে গোবরজল ছিটায়, উঠান ঝাঁট দেয়। খর-খর-খর সপ-সপাৎ।

শেষটা টুনিমণি বিদ্রোহ করেঃ আর তো পারি নে মাসি তোমার জ্বালায়। রাত না পোহাতে আজকাল ঝাঁটা ধরছ।

রাধি হাসেঃ তোর গায়ে তো লাগে না।

কানে লাগে। এক পহর রাত থাকতে শুরু কর, ঘুম কেঁচে যায়। ভাতের কষ্ট সওয়া যায়, ঘুমের কষ্ট পারি নে। উঠোন ঝাঁট দেওয়া একটু বেলায় হলে ক্ষতিটা কি?

রাধি বলে, আমার গা ঘিনঘিন করে টুনি, যতক্ষণ না ঝাঁট দিয়ে ফেলি। সকালবেলা ঠাকুরের নাম করতে করতে উঠতাম, কিন্তু আর পারি নে। মনে হয়, আদাড়-আস্তাকুড় জমে আছে। তার মধ্যে ঠাকুরের নাম হয় না। ঝাঁট দিয়ে গোবরজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নিই।

হঠাৎ সে সপাৎ-সপাৎ করে ঝাঁটা মারতে লাগল মাটির উপরে।

টুনি বলে, কী মারছ মাসি, সাপটাপ নাকি?

রাধারাণী কেমন একভাবে তাকায়। বলে, হ্যাঁ টুনিমণি। কত সাপ কিলবিল করে বেড়িয়েছে, বৃষ্টি হয়েছিল তো—নরম মাটির উপর দাগ পড়ে আছে।

খানিকটা অপ্রত্যয়ের ভাবে টুনি ঘর থেকে উঠানে নেমে এল। রাধি পাগলের মতো উঠানের ভিজা মাটিতে ঝাঁটার পর ঝাঁটা মারছে।

ঠাহর করে দেখে টুনি বলে, সাপ কোথা গো? মানুষ হেঁটে বেড়িয়েছে, সেই দাগ।

সন্ধ্যাবেলা এর একটাও ছিল না। রাতের মধ্যে ছোট-বড় কত পা পড়েছে। কত মানুষের!

কণ্ঠে কান্নার সুর এল রাধির। বলে, রাতে যে উঠোনে মচ্ছব পড়ে যায়। কেন, আমি কী? কোন লোভে আসে নচ্ছারগুলো?

উৎপাত দিনকে দিন বেড়ে চলেছে। নচ্ছার ছোকরার দল শুধু নয়, মান্যগণ্য প্রবীণেরাও ক্রমশ দেখা দিচ্ছেন। মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে অতিশয় সতর্কভাবে তাঁদের চলাফেরা, সেইজন্যে আরও বিপাকে পড়ে যান।

বড়ঘরের উত্তরে অনতিদূরে শীতল বাঁড়ুয্যের বাগিচা। লিচু পাকতে শুরু হয়েছে। বাদুড়ে না খায়, সেজন্য ফলন্ত ডালগুলো জালে ঢেকে দিয়েছেন। কিন্তু ইস্কুলে যাবার পথ বাগিচার পাশ দিয়ে। ছেলেগুলো বাদুড়ের বেশি, ইস্কুলে না গিয়ে গাছের মাথায় চড়ে বসে। তাড়া দিলে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়। বাঁড়ুয্যেমশায় এবছর তাই কাঁটাতারে বাগিচা ঘিরেছেন। হুট করে অমন ঢোকা যাবে না, তাড়া খেয়ে চোঁচা দৌড়ও দিতে পারবে না।

দুপুর রাতে বিষম একটা শব্দ বেড়ার দিকে। কী পড়ল রে, রসিক নাগর কোনটা অপঘাতে মরে দেখ। গালি দিতে দিতে হেরিকেন হাতে রাধি দোর খুলে বেরোয়। এই এক চিরকালের ব্যাধি, লোকের কিছু ঘটলে তখন তার ভয়ডর থাকে না, চুপচাপ ঘরে থাকতে পারে না। আপন-পর, ভাললোক-মন্দলোক, যে-ই হোক।

অপর কেউ নয়—সেকেণ্ড পণ্ডিত মশায়। স্বয়ং কাশীনাথ তর্কতীর্থ—পরিবার গত হয়ে অশেষ ভোগান্তি যাঁর। মানী লোক বলেই বুঝি উঁচুতে উঠেছিলেন, আজেবাজে দশজনার মতো উঠোনে না ঘুরে। উঁচু লিচুডালে বসে নিরিবিলি ঠাহর করা যায় ভাল। কিম্বা বাড়ি থেকে একদিন দূর-দূর করে তাড়িয়েছিলেন তো—সেজন্য রাধির বাড়ির এলাকার মধ্যে পা দিতে ভরসা হয় নি। আঁধারে ভাল ঠাহর করতে পারেন নি, সরু ডাল ভেঙে এসে বেড়ার উপর পড়েছেন।

মানের কী দায়—কাঁটাতারে ছিঁড়ে সর্বাঙ্গে যেন লাঙল চষে গিয়েছে, কিন্তু উঃ—বলে আওয়াজটুকু করবার উপায় নেই। ধরে তুলে রাধারাণী দাওয়ায় বসিয়েছে, তখনও কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢেকে আছেন। বাড়ি গিয়ে কৈফিয়ত দিলেন, স্বভাবের প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে ন্যাড়াসেজির ঝোপের উপর পড়েছিলেন না দেখে।

পরের দিন শীতল বাঁড়ুয্যে বাগানে এসে স্তম্ভিত। শালের বাত্তির সঙ্গে পেরেক ঠুকে কাঁটাতার বসানো, সেই বেড়ার অতখানি ভেঙেচুরে মাটির উপরে পড়েছে।

বাঁড়ুয্যে চেঁচামেচি করেছেনঃ এ তো বড় বিপদ! শক্ত করে তারের বেড়া দিয়েও ঠেকানো যায় না—

রাধির কানে গেছে। খানিকটা স্বগতভাবে বলে, ছেলেগুলো কাঁটাতারে ঠেকায়, ধেড়েগুলোকেই ঠেকানো যায় না। হলে তো জো-সো করে তার দিয়ে আমার উঠোনটাও ঘিরে ফেলতাম।

শীতলের ভাইপো ভগীরথ প্রণিধান করে বলে, গাছে চড়েছিল কাকা। উপর থেকে ডাল ভেঙে বেড়ার উপর পড়েছে।

শীতল বলে, মানুষ নয়—মোষ তবে গাছে চড়েছিল। মানুষ পড়ে গিয়ে এরকম ভাঙে না।

রাধির পুনশ্চ স্বগতোক্তি ঃ মোষ নয়, ঐরাবত। মোষের ওজন আর কতটুকু?

= চোদ্দ =

চলল এই রকম। অবস্থা ক্রমশ আরও সঙ্গিন। উঠান কিম্বা বাড়ুয্যের বাগিচা নয়—মানুষ ইদানীং দাওয়ায় উঠে ধুপধাপ করে। দরজায় টোকা দেয়। সাড়া পেল না তো ঝাঁকাঝাঁকি করে দরজা, লাথি মারে। রাধি চেঁচামেচি করে দেখেছে—উল্টো ফল। উপদ্রব বেড়ে যায়। মিহি গলায় সে বলে, যাও ভাই, লোক রয়েছে ঘরে। এখন হবে না।

বিকৃত সুরে—গলা শুনে মানুষটা না চেনা যায়—একদিন রাধির কথার পালটা জবাব এলঃ এমনি আসি নি গো, পকেট ভরতি নোট। দরজা খুলে দেখ।

রাধারাণী হাসে—যেন হাসছে, সেইরকম ভাব দেখায়। বলে, মরণ! টাকার লোভ দেখাচ্ছে। টাকা সবাই দিয়ে থাকে, মুফতের কেউ নয়। ঘরে লোক থাকলে কি করব?

ব্যঙ্গধ্বনি বাইরে থেকে ঃ শহরের হীরালাল ডাক্তারের পশার গো! রোগি মোটে পাছ ছাড়ে না।

রাগে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না রাধারাণীর। অভিনয়ের মুখোশ খসে পড়ে। দড়াম করে হুড়কো খুলে বেরিয়ে আসে দাওয়ার উপর। একবার শুরু করে দিলে কিছুই আর মুখে আটকায় না। এ-পথের যা দস্তুর। আপনারা বিদগ্ধজনে বলেন, গালির ব্যাপারে রাষ্ট্রভাষা হিন্দী বড় জবর। প্রাকৃত বাংলার প্রতাপটা দেখে আসুন একবার দয়া করে অজ-পাড়াগাঁয়ে গিয়ে। দেখেশুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। নৈশ প্রেমিকের পিতৃকুল ও মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন চতুর্দশপুরুষ সম্পর্কে রাধি তারস্বরে বিশেষণের পর বিশেষণ প্রয়োগ করে চলেছে। পর পর দু-তিন ডজন বিশেষণ চলল, মুড়োদাঁড়া নেই। দরিয়ার মুখে নদীস্রোতের মতন।

বলে, আমি তো নষ্ট মেয়েমানুষ। নিজের ঘরে দোর দিয়ে ঘুমচ্ছি। তোরা সব দিনমানের ঋষিপুত্তুর রাতে এসে ভূতের উৎপাত লাগাস। গোবর-জল ছিটিয়ে যে কূল পাই নে সকালবেলা।

তুমুল চেঁচামেচির ছিটেফোঁটা ঘুমন্ত টুনিমণির কানে গিয়ে থাকবে। পরের দিন সদুপদেশ দিচ্ছে ঃ গালাগাল দাও কেন মাসি? ওতে আরও পেয়ে বসে। ঘরে ঢুকতে পারছে না তো ওই গালি শুনবার লোভে আসবে মানুষ। দরজা ঝাঁকাঝাঁকি করে বেশি করে গালি আদায় করবে।

কথা ঠিক বটে। বাইরের মচ্ছবটা পরের রাতে সত্যিই যেন অনেক বেশি। মানুষ হল মহিষের মতো এক জীব—যত পাঁক গায়ে লাগবে, তত খুশি।

আজকে রাধি প্রতিজ্ঞা করেছে, রাগের মাথায় দরজা খুলে অমন কাণ্ড করবে না। বেরুবে না মরে গেলেও। মুখও খুলবে না। যা খুশি করুকগে ওরা। ভূতের নৃত্যে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ফিরে চলে যাবে।

নৃত্যই বটে। দাওয়ার মাটি দুমদাম করে কাঁপে। রাধারাণী দু-কানে আঙুল দিল—যাতে কিছু শুনতে না পায়। নড়াচড়া করে না, একেবারে মরে আছে যেন সে। মড়ার সঙ্গে কতক্ষণ শত্রুতা চালাবে, মড়ার কাছাকাছি কতক্ষণ টিকতে পারবে?

এদিকে না পেরে শেষটা ঢেঁকিশালে গিয়ে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। ঢ্যা-কুচকুচ ঢ্যা-কুচকুচ। এই রেঃ—চিঁড়ের ধান ভিজানো কলসিতে, টুনিমণিকে নিয়ে সকালবেলা চিঁড়ে কুটবার কথা। শনির দৃষ্টি সেদিকেও পড়েছে, চিঁড়ে-কুটে খেয়ে তবে বুঝি মচ্ছব শেষ করবে।

না, গালিগালাজ একেবারে নয়—কিন্তু ঘরের বার না হয়ে উপায় কই? চকচকে ধারাল রামদাখানা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে রাধি দরজা খোলে। টিপিটিপি যাবে চলে ঢেঁকিশালে। গিয়ে যেখানে চিঁড়ে কোটা হচ্ছে, ঝেড়ে দেবে কোপ। মরে তো ভালই। তার জন্যে যদি রাধারাণীর ফাঁসি হয়, আরো ভাল। সে মরণে সান্ত্বনা থাকবে, শত্রু একটা নিপাত করে গেলাম।

দরজা খুলতে হড়াস করে কী বস্তু ঢেলে পড়ল দাওয়ায়। দাওয়ায় যেই নেমেছে, পা পিছলে পড়ে যায়। হাতের রামদা ছিটকে পড়ে দূরে। ছিটকে গেছে রক্ষা, ওই দায়ে নইলে নিজেরই কাটা পড়বার কথা। পড়ে গিয়ে ব্যথা কতটা লেগেছে, সেটা বুঝবার আগে ওয়াক করে বমি ঠেলে এল। অন্ধকারে চোখে ঠাহর হচ্ছে না বটে, কিন্তু দুর্গন্ধে বস্তুটা মালুম পাওয়া গেল। গায়ে মাথায় কাপড়চোপড়ে লেপটে গেছে। লিচুতলার দিক থেকে হাসির আওয়াজ আসে খিকখিক করে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

আলো জ্বালবার প্রয়োজন। কিন্তু দাওয়ার উপরে এই কাণ্ড, ঘরের মধ্যে যায় এখন কেমন করে? ওই বস্তু না মাড়িয়ে? পায়ে পায়ে সারা ঘর নোংরা হয়ে যাবে।

ডাকছে, টুনিমণি, ওরে টুনি, ওঠ একবারটি। দেখ উঠে কী কাণ্ড!

টুনি যথারীতি নিঃশব্দ। গা ঝাঁকিয়েও সাড়া পাওয়া যায় না, এ ডাক তো উঠানের দূর থেকে। রান্নাঘর থেকে হঠাৎ পাগলি তারা চেঁচিয়ে উঠল ঃ কানা ঠাকুর চোখে দেখে না, কালা ঠাকুর কানে শোনে না। মুখ পুড়িয়ে ঠাকুর ক্ষীরোদ-সমুদ্দুরে শয়ানে রয়েছে। অঙ্গে বাত হয়েছে, নড়নচড়ন নেই। মর, মর—অকর্মার ধাড়ি!

বড়ঘরে যেতেই তো হবে একবার—আলো জ্বালতে না হোক, তালাচাবি আনতে। পুকুরে গিয়ে ডুব না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ঘুমন্ত টুনিমণির

ভরসায় ঘর খোলা রেখে ঘাটে গেলে যা-কিছু আছে হাতিয়ে নিয়ে যাবে অলক্ষ্যের হাস্যরত মানুষগুলো। নড়া চলবে না এখান থেকে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারা রাত কাটাবে নাকি এমনি ভাবে? উৎকট গন্ধে গা বমি-বমি করছে, কখন বমি হয়ে যায়। হায় ভগবান!

মনের আক্রোশে আততায়ীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠেঃ ও অলপ্পেয়েরা, বলি তোদেরও নরকভোগ কমটা কী হল? এই জিনিস ভাঁড়ে করে বয়ে তো এনেছিস এতখানি পথ!

চৌকিদার রোঁদে বেরিয়ে হাঁক দিচ্ছে। অকূল সমুদ্রের তরী—রাধি এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। চেঁচাচ্ছেঃ ও নটবর, শোন—দেখসে এসে কী কাণ্ড আমার উঠোনে।

নটবর ছুটে এসে দাওয়ায় লণ্ঠন তুলে দেখে বলে, এ-হে-হে—এমনধারা করে মানুষে!

উঠানের এদিক-ওদিক লণ্ঠন ঘোরাচ্ছে। রাধি বলে, দেখছ কি—কেউ নেই আর এখন। পালিয়েছে। আলো দেখেছে, চামচিকে আর থাকতে পারে? এখানে একটু দাঁড়াও নটবর, গোটাকতক ডুব দিয়ে আসি।

ডুব দিয়েই হল না। ছাঁচতলায় বাইয়ের কলসি—সেই কলসি ভরে ভরে জল এনে দাওয়ায় ঢালে। কাঁচা মেজে কাদা-কাদা হয়ে যায়। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, অত্যাচারটা দেখ নটবর। এক কুনকে চিঁড়ের ধান ভিজিয়েছিলাম। বলি, টুনিমণি আছে আমি আছি, আমরা দু-জনে ভেনে-কুটে নেব। তা দেখ, ওরাই নয়-ছয় করে গেল। ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছি—কিন্তু ঘর খোলা রেখে ওদিকে কেমন করে যাই?

ঢেঁকিশালে গিয়ে দেখে—যা ভাবতে পারা যায় না—ওই ভাঁড়ের বস্তু খানিকটা লোটের মধ্যে ঢেলে পাড় দিয়েছে। ছিটকে ঘরের চাল অবধি উঠে গেছে। কত শয়তানি আসে যে মানুষের! সকালবেলা চিঁড়ে কোটা বন্ধ। ঢেঁকিশালমুখো হওয়া যাবে না এই নরককুণ্ড সাফাই না হওয়া অবধি।

= পনের =

হীরককান্তি বাড়ি এসেছে গ্রীষ্মের ছুটিতে। তড়িৎকান্তি মিত্তিরের ছেলে হীরক। টুনিমণি দেখেছে তাকে। পাশের গাঁয়ের সঙ্গে ফুটবল-ম্যাচ—হীরক মাঠ পরিষ্কার করছিল ছেলেদের নিয়ে। এক মুহূর্ত চুপচাপ থাকবার পাত্র নয়—সমবয়সি কতকগুলোকে জুটিয়ে একটা না একটা হুজুগে মেতে আছে। এ স্বভাব ইস্কুলে পড়বার সময় থেকে। দরিদ্র-ভাণ্ডার করেছিল কাপাসদা গ্রামে। লাইব্রেরি। নৌকো-বাইচ আর সাঁতার-প্রতিযোগিতা। এখন কলকাতায় থাকতে হয় বলে গ্রাম ঠাণ্ডা। দলের ছেলেগুলো কতক কাজেকর্মে বাইরে চলে গেছে, বেশির ভাগ গ্রামের নিষ্কর্মা।

হীরকের নামে রাধি উজ্জ্বল হয়ে ওঠেঃ একলা এল, না আমার চাঁপাফুলকে নিয়ে এসেছে? খোঁজ নিয়ে দেখ তো টুনি।

ভক্তিলতার সঙ্গে সেই যে রাধি চাঁপাফুল পাতিয়েছিল। কলকাতার মেয়ে—তাদের ওখানে থেকে হীরক মেডিকেল কলেজে পড়ে। শ্বশুরের খরচায় ডাক্তারি পড়াটা হবে, তড়িৎকান্তি সেইজন্য সকাল সকাল ছেলের বিয়ে দিলেন। বুড়া বয়সে বাতে তাঁকে বড় কাহিল করেছে। শয্যাশায়ী—নিরাময় হবার আশা নেই এ-বয়সে; এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্র হীরকও বাতরোগের বিশেষজ্ঞ নয়। তড়িৎকান্তি তবু সুযোগটা নিয়ে নিলেন, রোগের সম্বন্ধে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখলেন কলকাতায়। আসুক ছেলেটা বাড়িতে—বাপ-মায়ের কাছে কয়েকটা দিন থেকে বাগানের আম-কাঁঠাল ও ঘরের গাইয়ের দুধ খেয়ে চলে যাবে। হীরক একলাই এসেছে, ভক্তিলতাকে পাঠান নি তার বাবা। পাড়াগাঁয়ে উড়োকালে সাপখোপের ভয়—দশ-বারটা দিনের জন্য কেন তবে আর?

কিন্তু বাপ-মায়ের কাছে হীরক থাকে কতক্ষণ! হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। গ্রামের গৌরব, য়ুনিভার্সিটির দুটো পরীক্ষাতেই সে স্কলারশিপ পেয়েছে। টুনিমণিকে রাধি বলে, জন্মনেতা হয়ে এসেছে হীরক-দা। এক একটি মানুষ থাকে ওই রকম। ছোটবেলায় আমরা ওর কত সাগরেদি করেছি। সাঁতারের পাল্লা হত—মেয়েদের পেন্সিল ছুরি চুলের-ফিতে এইসব প্রাইজ দিত। এক-আধটা এখনো বোধ হয় পড়ে আছে আমার বাক্সর তলায়। আমার গাছে চড়া দেখে হীরক-দা পিঠে থাপ্পড় দিয়ে বলেছিল, বীরকন্যা! উঃ, কত কাণ্ড করা গেছে এক দিন! আমরা সব বদলে গেছি, হীরক-দা আমার ঠিক সেই রকম।

হীরক গ্রামে এসেছে, তার কাছে নালিশ করবে। বিচার পাবে সুনিশ্চিত। তোমার সামনে তো সাধু-সচ্চরিত্র সদাশয় ছেলে এরা সব—কিন্তু রাতে আমার বাড়ি কি দেশদেশান্তরের মানুষ আসতে যায়? আসে এরাই। আমায় তাড়িয়ে তুলছে। আমি ভাল হয়ে থাকব, তার জন্য কত চেষ্টা করছি। কেউ তা হতে দেবে না।

ফুটবলের মাঠে যাবে তো সকলে। শীতল বাঁড়ুয্যের বাগানের ওধার দিয়ে পথ। বাড়িতে গেলে তড়িৎকান্তি হয়তো দূর-দূর করবেন—কাশীনাথ তর্কতীর্থ যেমন করেছিলেন। রাধি তাই ঠিক করেছে হীরককে পথে ধরবে। দাঁড়িয়ে আছে সেই কখন থেকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হবার জোগাড়। অবশেষে কলরব পাওয়া গেল। দলের ওই হতচ্ছাড়াগুলোকে রাধি মুখ দেখাতে চায় না। তারা তো তাকিয়ে দেখে না, চোখ দিয়ে গেলে। হীরকও আজ ওদের সঙ্গে মিশে ওদেরই একজন হয়ে চলেছে—রাধারাণীর মনে বড় লাগে। সদাশিব ভোলানাথ তুমি -তোমায় ঘিরে যারা চলেছে, জান না, তারা প্রেত আর ব্রহ্মদৈত্য।

তেঁতুলগুঁড়ির পাশে রাধি সরে দাঁড়িয়েছিল. হীরককান্তি চকিতে একবার তাকাল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নিল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিল—প্রায় দৌড়ান। টের পেয়েছে, পাপের বাসা কাছাকাছি এইখানে—পাপ থেকে ছুটে পালাচ্ছে যেন। রূপসী রাধিকে তুচ্ছ করে একটা মানুষ চলে যায়, এমনি ব্যাপার আজ এই প্রথম। বড় আনন্দ রাধারাণীর—আনন্দে নাচতে নাচতে সে বাড়ি ফিরে গেল।

ভর সন্ধ্যায় রাধি সেই পথে আবার গিয়ে দাঁড়ায়। মাঠ থেকে ফিরছে। স্বামিজীর বই-পড়া কিশোরকালের সেই পবিত্র হীরক-দা আজও—তার হীরক-দা'র কাছে সঙ্কোচ কিসের? মাঝপথ অবধি এগিয়ে গিয়ে আগের দিনের মতো রাধারাণী বলে. কারা জিতল হীরক-দা?

ভ্রষ্টা মেয়ের দুঃসাহসে সঙ্গী ছেলেরা হতভম্ব। হীরকও জবাব দিল না।

চুপ করে আছ—হেরে গেছ। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি—

সহসা উচ্ছ্বাস থামিয়ে শান্ত হয়ে বলে, একটা কথা আছে হীরক-দা, আলাদা ভাবে বলতে চাই।

কঠিন কণ্ঠে হীরক বলে, কথা আমারও একটা আছে। সেটা সদরে সকলের মধ্যে বলি। কাপাসদা ছেড়ে তুমি চলে যাও। গ্রাম জ্বালিয়েপুড়িয়ে তুলেছ।

রাধি বলে, ঠিক উল্টো কথাই যে আমার। দুয়োরে খিল দিয়ে আমি নিরিবিলি থাকি, তোমার এই প্রেত-পিশাচগুলো গিয়ে জ্বালাতন করে। ক্ষমতা থাকে তো শাসন করে দাও। কেন ওরা অমন করবে?

হীরকের সঙ্গীদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে রাধারাণী ফরফর করে চলে গেল। হীরক দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভগীরথ বোমার মতন ফেটে পড়েঃ নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল নষ্ট মেয়েমানুষ।' আমাদের প্রেত-পিশাচ বলে গেল।

হীরক বলে, নষ্ট মেয়েমানুষ—সেটা শুধু মুখে বললে কি হবে?' প্রমাণ চাই তো কিছু।

হরিসাধন বলে, আজব বলছ হীরক। রাত দুপুরে চুপিসারের ব্যাপার—সাক্ষি রেখে কেউ নষ্টামি করে নাকি? মা জানে না, পেটের মেয়ে কখন কী করে আসে। স্ত্রী টের পায় না, কোল থেকে কখন স্বামী উঠে বেরিয়েছিল।

রাত্রি। আকাশ মেঘে ভরা। উল্টোপাল্টা বাতাসে গাছগাছালি পাগলের মতো মাথা দোলায়। বৃষ্টির পশলা মাঝে মাঝে।

হীরকেরা বিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অন্ধকারে জল চকচক করছে, ধানের চারা ডুবে গিয়েছে অকাল-বর্ষায়। ঢেউ উঠছে জলে। ছলাৎ-ছলাৎ করে ঘা দিচ্ছে ডাঙার গায়ে।

ডোঙা জোগাড় হয়েছে দুটো। পাশাপাশি বাইবে। জলের উপরে ঘুরে ঘুরে আলোর মাছ মারবে। তিনজন করে লাগে ডোঙায়। একজনে আলো ধরে ডোঙার মাথায় বসে, একজনের হাতে ধারাল দাও। আলো দেখে মাছ মাথা ভাসান দিয়ে ওঠে জলের উপর। একচুল নড়ে না, সম্মোহিত হয়ে আছে আলোর রশ্মিতে। দাও ঝেড়ে কোপ এবারে। ঘোলা জল পলকের মধ্যে রাঙা-রাঙা হয়ে যায়। জলে ডুববার আগে কাটা-মাছ তাড়াতাড়ি তুলে ডোঙার খোলে ফেলে দাও। মাছ কাটতে গিয়ে সাপও কাটা পড়ে কখন—তুলতে গিয়ে সভয়ে হাত ফিরিয়ে নেয়। ডোঙায় আর যে তৃতীয় ব্যক্তি—সে এতক্ষণ শক্ত করে লগি মেরে পাথরের মূর্তির মতো স্থির দাঁড়িয়ে। মাছের সামনে আলো ধরা ও মাছ কাটা—এ দুটো ব্যাপারের মধ্যে ওই লোক নেই। কিন্তু তার কাজ শক্ত সকলের চেয়ে। ডোঙা চালায় সে খুব নরম হাতে, আওয়াজ একেবারে নেই, জলের খলবলানিতে মাছ যাতে সরে না যায়। আলো-ধরা মানুষটা বাঁ-হাত তুলবে হঠাৎ এক সময়, সঙ্গে সঙ্গে লগি জলতলে বসিয়ে ডোঙা একেবারে স্থির। যেন চুন-সুরকি দিয়ে জলের সঙ্গে ডোঙাখানা গেঁথে দিয়েছে।

পাঁচজন বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে, গঙ্গেশ শুধু নেই। হীরকের ডোঙা গঙ্গেশের বাওয়ার কথা। ডাঙায় হাঁটাহাঁটির চেয়ে ডোঙায় চলাচল গঙ্গেশের বেশি রপ্ত; চৈত্র-বৈশাখে বিল শুকিয়ে গেলে ক'মাস তার বড় দুঃসময়। পা নামক অঙ্গযুগলের চালনা করতে হয়। বড় হাঙ্গামার ব্যাপার। পারতপক্ষে সে তখন বাড়ির বার হয় না।

ডোঙা বাওয়ার সেই মানুষ—গঙ্গেশই এসে পৌঁছল না। হীরক বলে, দেখা যাক আর একটু।

আবার এক ঝাপটা বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। গা কুটকুট করছে—তাই তো, মস্ত এক পানজোঁক উরুতে। রক্ত খেয়ে ঢোপা হয়েছে। রবারের মতন টেনে ছাড়াতে হয়। এঁটেল-মাটি চেপে দিয়ে রক্ত বন্ধ করে। তেপান্তর বিলে

কত আলো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। সকলে নেমে গেছে, আর দল বেঁধে এসে হাত-পা কোলে করে এরা বিলের ধারে দাঁড়িয়ে।

হীরক বলে, এখনো আসে না—কী আশ্চর্য!

ভগীরথ বলে, তুমি বেরিয়ে পড় হীরক। আমাদের ডোঙার হরিসাধন চলে যাক তোমার সঙ্গে। সে বাইবে।

তোমরা?

গঙ্গেশ আসে তো যাব। নয় তো গেলাম না। আমাদের কী—কতই তো যাচ্ছি। তুমি জলকাদা ভেঙে এদ্দুর এসে ফিরে যাবে, সেটা কিছুতে হয় না।

হীরক দৃঢ়স্বরে বলে, যাই তো সকলে মিলে যাব। নয়তো কেউ যাব না। মাছ মারা তো খাওয়ার জন্যে নয়—সকলে মিলে আমোদ করা। গঙ্গেশের বেশি পুলক—অত পথ ভেঙে গঞ্জ অবধি গিয়ে টর্চের নতুন ব্যাটারি নিয়ে এল। অথচ সময় কালে দেখা নেই।

ভগীরথ বলে, বর্ষার রাত্রে আরও বড় আমোদ পেয়ে গেছে অন্য জায়গায়। নিশ্চয় তাই। যাবে তো বল, আমি নিয়ে যেতে পারি সে জায়গায়। গিয়ে হাতে-নাতে ধরব।

একটা লোকের জন্য আয়োজন পণ্ড। এক কথায় সকলে রাজি। কোথায় আছে চল, ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে আসব।

পথ চলেছে পা টিপে টিপে। পা পিছলে যাওয়ার ভয়। তা ছাড়া নিঃসাড়ে যাওয়াই উচিত। টিপিটিপি পিছনে গিয়ে ক্যাঁক করে তার টুঁটি চেপে ধরবে। গঙ্গেশকে ধরবে, আর কপালে থাকে তো ফাউস্বরূপ অতিরিক্ত কিছু দেখা যাবে। মাঝ-বিলে মাছ ধরার চেয়ে সে মজা কিছু কম হবে না।

রাধির উঠোনে এসে পাঁচটা মানুষের দশটা চোখ নানান দিকে সঞ্চরণ করছে। ব্যাং ডাকছে খানাখন্দে, লিচুডাল থেকে টপটপ করে জল ঝরছে।

না, বাইরে কোনখানে তো দেখা যায় না।

ভগীরথ ফিসফিস করে বলে, তবে গঙ্গেশ ভিতরে ঢুকে পড়েছে। অভদ্রার মধ্যে ভিতরে ঠাঁই হলে বাইরে কি জন্য ভিজতে যাবে? দাঁড়াও—

দাওয়ায় উঠে পড়ে ভগীরথ। এরা সব ছাঁচতলায়। ঠুক-ঠুক করে টোকা দেয় দরজায়। তিনবার। পরিপাটি হাত, এই টোকার আওয়াজটা কেমন আলাদা। ভিতরে ঢুকবার সকরুণ আবেদন যেন।

একটু বিরতি দিয়ে পুনশ্চ তিনবার।

রাধারাণীর গলাঃ লোক রয়েছে, হবে না এখন।

বিজয়গর্বে ভগীরথ দাওয়া থেকে নেমে আসেঃ শুনলে তো? নিজের কানে শুনতে পেলে। সতীসাধ্বী বলে সেই যে পথের উপর জাঁক করে এল—তার

নিজের মুখের প্রমাণ নাও। লোক আলাদা কেউ নয়—গঙ্গেশ। আমরা জলে ভিজছি, সে হতভাগা ভিতরের তক্তাপোশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েছে।

হীরকই এবার দাওয়ায় উঠে দুমদুম করে দরজায় লাথি মারে। রাধি করকর করে ওঠেঃ ভস্মার রাতে বেরিয়েছিস মুখপোড়ারা, ঘরে তোদের মা-বোন নেই?

পাড়াগাঁয়ের এইসব ছোঁড়া কাপুরুষ নয়। গালি শুনে এ-ওর গা টেপে আর ফিকফিক করে হাসে। হীরক গর্জন করে উঠলঃ দুয়োর খোল বলছি, নয় তো ভেঙে ফেলব।

গলায় চিনতে পেরে নিমেষের মধ্যে রাধারাণী একেবারে ভিন্ন মানুষঃ হীরক-দা তুমি? ওমা আমার কত ভাগ্যি, তুমি এসেছ বাড়ির উপর—

শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলঃ বৃষ্টিতে নেয়ে এসেছ একেবারে। কী কাণ্ড বল দিকি। আমার কাপড় দিই, তাই পরে ভিজে কাপড় শুকিয়ে ফেল।

এইবারে এতক্ষণে উঠানের দিকে নজর পড়ল। বলে, আপদগুলো সঙ্গে জুটিয়ে এনেছ, একলা আসতে বুঝি সাহস হল না হীরক-দা? কামরূপ-কামিখ্যের মতো গুণ করে ফেলি যদি তোমায়? হি-হি-হি। তা করব না—চাঁপাফুল রক্ষে রাখবে তা হলে?

হাসতে হাসতে কণ্ঠ সহসা কাতর হয়ে ওঠে। বলেঃ আজকে তোমার পিছন ধরে এসে ওরা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড্ড কষ্ট দেয়, আমি বলেই টিঁকে আছি। ভিতরে এস হীরক-দা, ওগুলোকে যেতে বলে দাও। দুঃখের কথা সব বলি। কথা আমার গলা ছাপিয়ে উঠছে।

তার আগেই হীরক কাদা-পায়ে ঢুকে পড়েছে। আজকে টুনিমণি নেই, রান্নাঘরে তারাও নেই। কামারপাড়ায় বিয়ে হচ্ছে, বিয়েবাড়ি গেছে। একলা রাধারাণী। টর্চ ফেলে হীরক কিছু না দেখতে পেয়ে সকলকে ডাকেঃ করছ কী তোমরা? চলে এস।

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে তারা বিছানা উলটায়, তক্তাপোশের নিচে উঁকি-ঝুঁকি দেয়। চালের কলসির ওদিকটা গিয়েও নাড়ানাড়ি করছে। পাঁচজন মানুষ ওইটুকু ঘরের মধ্যে পাকচক্কর দিচ্ছে।

আরক্ত মুখে কঠিন কণ্ঠে রাধারাণী বলে, রোজ রাত্রে এরা চুরির মতলবে আমার বাড়ি ঘোরাফেরা করে, তুমি আজ ডাকাত হয়ে ঢুকলে হীরক-দা। কিন্তু পায়ের কাদাটা যদি ধুয়ে আসতে! বাইরে কলসিতে জল আছে। লেপাপোঁছা গোবরমাটি-দেওয়া ঘর তুমি তছনছ করে দিলে।

হীরক বলে, থুতু ফেলতেও আসতাম না তোমার লেপাপোঁছা ঘরে। গঙ্গেশটা কোথায় দেখিয়ে দাও। তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ও, গঙ্গেশ বুঝি এখানেই আছে—এই ঘরের মধ্যে? দেখবার তো কসুর করছ না। চালের কলসি তেলের শিশি কিছুই বাদ নেই।

হীরক বলে, হার স্বীকার করছি। তুমি বলে দাও, কোনখানে আছে।

ঘরের আড়ার দিকে রাধারাণী আঙুল দেখায়। পাঁচজনের পাঁচজোড়া চোখ উপরমুখো।

ভগীরথ অধীর হয়ে বলে, কোথায়?

ওই যে, দেখছ না—ভয় পেয়ে গেছে গঙ্গেশ, গুটিগুটি সরে যাচ্ছে।

নজর করে দেখে নিয়ে হীরক বলে, টিকটিকি একটা। ওই দেখাচ্ছ?

আমি যে মন্তর জানি। কামরূপ-কামিখ্যেয় ভেড়া করে রাখে, গঙ্গেশকে আমি টিকটিকি করে রেখেছি।

বলে খিলখিল করে যেন ঢেউ দিয়ে দিয়ে হাসতে লাগল। সে হাসির শেষ হয় না। অবমানিত ছোঁড়ার দল চিৎকার করে ওঠেঃ আমাদের বোকা বানিয়ে হাসছ তুমি এখন?

বানাতে হল আর কোথা?

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে রাধি বলে, ঘর তো এইটুকু। টর্চ ফেলে তন্নতন্ন করে দেখলে, তবু বলে মানুষ বের করে দাও।

ভগীরথ হুঙ্কার দিয়ে বলে, মানুষ আছে—নিজের মুখেই তো স্বীকার করলে। সকলে আমরা শুনেছি।

রাধি বলে, মিথ্যে বলতে হয় আত্মরক্ষার জন্য। তোমাদের পিরীতের ঢেউ নয়তো সামলাতে পারি নে—ঘর-দরজা ভেঙে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

বলতে বলতে কণ্ঠ প্রখর হয়। হীরকের দিকে চেয়ে বলে, এই নালিশটাই তোমার কাছে জানাতে চেয়েছিলাম। কেন আমায় ভাল থাকতে দেবে না? কলকাতায় কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তোমার মেলামেশা—ভেবেছিলাম এদের নোংরামির বাইরে তুমি। কিন্তু আমার একটা কথাও কানে নিলে না। গ্রাম ছাড়তে হবে, এই হল তোমার রায়। স্রোতের কুটোর মতো ঠেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু তোমার সাগরেদগুলোর কী মুশকিল হবে, ভেবে দেখেছ? এ তবু গাঁয়ের মধ্যে চেনা ঘরে এসে ঢু দিচ্ছে। আমি চলে গেলে জল ঝাঁপিয়ে হোঁচট খেয়ে কোন ভাগাড়ে গিয়ে মরবে, ঠিকঠিকানা নেই।

দলটা বেরিয়ে যেতে রাধারাণী দরজায় সশব্দে হুড়কো তুলে দিল।

গঙ্গেশকে পথেই পাওয়া গেল। তার নিজের পুকুরটা কানায় কানায়। সোঁতা ছেড়ে দিয়ে মাছ মারছিল এতক্ষণ। সেই ঝোঁকে দেরি হয়ে গেল। তা নাই বা হল আলোর মাছ মারা! দেড় ঝুড়ি মাছ পেয়েছে, সকলকে খাওয়ার মাছ দিয়ে দেবে। কষ্ট করে বিল ঠেঙিয়ে যা মিলত, ভালই হবে সে তুলনায়।

= ষোল =

হারাণ মজুমদার হঠাৎ এসে পড়লেন তিলডাঙা থেকে। বলেন, খবর পাই নে অনেকদিন। দেখতে এলাম।

মনোর মেয়েকে ফেলে দিতে পারবেন না, বাড়ি থেকে তাড়াবার সময় বলে দিয়েছিলেন। তাই বোধ হয়। চোখের দেখা দেখতে উতলা হয়ে এতখানি পথ আসবেন, মামা কিন্তু এ প্রকৃতির ছিলেন না আগে। চেহারাতেও যা দেখছে—যেন শ্মশানের চিতার উপর থেকে সদ্য উঠে আসছেন। বিষম-কিছু ঘটেছে। ব্যস্ত হতে হবে না, বেরিয়ে আসবে ধীরে ধীরে দু-পাঁচ কথার মধ্যে।

তা-ই হল। জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন। রাধি আম কেটে দিয়েছে রেকাবিতে, কাঁঠালের কোয়া ছাড়িয়ে দিয়েছে। মুখে ফেলতে ফেলতে হারাণ বললেন, আরতিকে নিয়ে ভারি বিপদ!

অসুখ করেছে?

অসুখ ছাড়া আবার কি। বিষম অসুখ। হীরালাল ডাক্তারকে জানিস তো—তোর শ্বশুরবাড়ির চিকিচ্ছেপত্তরও তিনি করেন। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু সাফ জবাব দিয়ে দিলেন। সেখান থেকে সোজা তোর কাছে এসেছি। তুই যা করিস এখন।

রাধি ভেবে পায় না, মহকুমা-শহরের অমন বিচক্ষণ ডাক্তার যে ব্যাধিতে হার খেয়ে গেলেন, তার জন্য এখানে ছুটে আসবার হেতুটা কি? সে কী করতে পারে? আরতির জন্য ভাবনা হচ্ছে। গোড়ার ব্যবহার যাই হোক, শেষের দিকে কিন্তু সে বড় যত্ন করত রাধিকে। আহা, ভাল হয়ে উঠুক বেচারি, রোগ নিরাময় হোক।

হীরালাল ডাক্তারের সঙ্গে হারাণের পুরণো ঘনিষ্ঠতা। কী যেন একটু আত্মীয়তাও আছে। মরীয়া হয়ে মহকুমা-শহর অবধি এসে হারাণ তাঁর কাছে গিয়ে পড়লেন।

ইচ্ছে করে অধিক রাত্রেই গেলেন। সাড়ে-ন'টা বাজে, রোগি তবু একেবারে ছাড়ে নি। জন পাঁচ-ছয় এখনো। একজনের বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে হীরালাল বললেন, কী সমাচার হারাণ-দা? কবে এলেন?

প্রশ্নই করলেন। জবাবের অপেক্ষা না করে রোগির দিকে তাকিয়ে বললেন, দুটো বুকেই প্যাচ পাওয়া যাচ্ছে। দেখি, পিঠ ফিরে বসুন।

বুক-পিঠ পরীক্ষার পর আরও কিছু প্রশ্ন করে ডাক্তারবাবু প্রেস্কৃপশন লিখছেন। হঠাৎ একবার মুখ তুলে বলেন, কই, কিছু বললেন না তো!

হারাণ বলেন, এদিককার সব মিটে যাক।

এই ক'জনের হলেই বুঝি মিটে গেল? তবেই হয়েছে। কত রোগি আসবে এখনো। মিটতে সেই রাত দুপুর।

বলতে বলতে দ্বিতীয় জনের বুকে যন্ত্র বসিয়ে দেন। সে রোগি বলে, বুকের কিছু নয় ডাক্তারবাবু, দাঁত চাগিয়েছে। এমনি বোধ হয় যাবে না, তুলে ফেলতে হবে। দেখে দিন একটু ভাল করে।

এমনি ভাবে একের পর এক রোগি দেখে যাচ্ছেন। হারাণ এক পাশে চোরের মতো চুপটি করে বসে। বাড়ি থেকে সকাল সকাল দুটি খেয়ে বেরিয়েছেন, তারপর থেকে নিরম্বু। উদ্বেগে খাওয়ার কথা মনেও হয় নি। বয়স হয়ে গেছে—উদ্বেগ আর ক্লান্তিতে এখন ঝিমিয়ে পড়ছেন। রোগির পঙ্গপাল কতক্ষণে খতম হবে, কে জানে!

হঠাৎ এক সময় হাত ধুয়ে ফেলে হীরালাল সিগারেট ধরালেন। হারাণের দিকে চেয়ে বলেন, চলুন, চেম্বারে গিয়ে শুনে আসি। আপনারা বসুন একটুখানি।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বলেন, বলুন কি ব্যাপার।

শান্তিবালা সবিস্তারে যাবতীয় লক্ষণ বলে দিয়েছেন। কথাটা ডাক্তারের কাছে কি ভাবে পাড়তে হবে, ট্রেনের মধ্যে সারাক্ষণ হারাণ ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছেন। কিন্তু সময় কালে মুখ দিয়ে কিছু বেরুতে চায় না। বললেন, বিপদে পড়ে এসেছি ডাক্তারবাবু।

হীরালাল হেসে বললেন, সে তো জানিই। বিপদ না হলে কেউ শখ করে কি উকিল-ডাক্তারের বাড়ি আসে?

মানে, আমার এক আত্মীয়, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু--তার মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। সেই জন্যে আপনার কাছে আসা। কী হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, ছেলে হবে কিম্বা মেয়ে—

হারাণ ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন, কুমারী মেয়ে যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি সুরে বললেন, কুমারী হোক সধবা-বিধবা যাই হোক, ওই দুয়ের একটা হবে। তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রোগপীড়ে যখন নয় হারাণ-দা, আমার কিছু করবার নেই। আচ্ছা—

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। হারাণ আর্তনাদ করে উঠলেনঃ মানের দায় ডাক্তারবাবু। বড় আশা করে এসেছি। আমার সেই আত্মীয় খরচপত্র করতে পিছপাও নয়। যার তার কাছে এ সমস্ত বলা যায় না। আপনি আমার পরমাত্মীয়—

তাই আমায় ফাঁসাবার জন্য এসেছেন। তীক্ষ্নদৃষ্টিতে হারাণের দিকে চেয়ে হীরালাল বলতে লাগলেন, আপনার মুখ-চোখ দেখে বুঝছি, মেয়েটা খুব নিকট-জন। উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে সতর্ক হয়ে করা যায় বইকি! রোগিনীর স্বাস্থ্যের কারণে করতেও হয় কখনসখন। কিন্তু আপনি যে রকম বলছেন, ঘোরতর বেআইনি কাজ। জেলে যাওয়ার ব্যাপার। টাকার লোভে ভুঁইফোঁড় ডাক্তার কেউ হয়তো রাজি হবে। প্রসূতিকে তারা মেরেই ফেলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। নয় তো সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে দেয়। ওসব করতে যাবেন না, হিত কথা বলছি।

বেরিয়ে আবার রোগির ঘরে গেলেন। এক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে হারাণ অন্য দরজা দিয়ে বেরুলেন। ডাক্তারের মুখোমুখি হতে এখন লজ্জা করছে। উঃ, কী শত্রুতাই যে করল নচ্ছার মেয়ে!

তখন ভাগনীকে মনে পড়ে। শান্তিবালা তা-ও বলে দিয়েছেন। ডাক্তার হলে নিরাপদ। নয় তো অন্য যেসব পথ আছে।

রাধারাণী নিঃশব্দে মামার বিপদের কথা সমস্ত শুনল। হারাণ বলেন, ডাক্তার মেজাজ দেখাল আমার কাছে। কত লাঞ্ছনাই আছে যে কপালে! কালামুখি মরে তো রক্ষেকালীর পুজো দিই।

রাধারাণী বলে, মরলে বেশি বিপদ মামা। মড়ার পেট চিরে দেখবে, পেটের মধ্যে বাচ্চা পাবে। এই অবস্থায় বাপ-মায়েরা যা করে—বলবে, তোমরাও তাই করতে গিয়ে মেরে ফেলেছ। পুলিস হাতকড়া দিয়ে সবসুদ্ধ টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

হারাণ খপ করে রাধারাণীর হাত জড়িয়ে ধরলেনঃ সেইজন্যে তোর কাছে এসে পড়েছি মা। তুই একটা উপায় করে দে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাধারাণী বলে, নষ্ট মেয়েমানুষ আমি, আনুষঙ্গিক সকল কাজে ওস্তাদ। তাই ভেবেই দরদ হল বুঝি আজ ভাগনীকে দেখতে আসবার?

হারাণ আকুল হয়ে বলেন, গুরুজন হয়ে আমি তোর পা জড়িয়ে ধরব, সেইটে চাচ্ছিস রাধি?

রাধারাণী খিলখিল করে হেসে ওঠেঃ মন্দ মেয়েরও দরকার পড়ে তবে তোমাদের!

হারাণ বলেন, তুই মন্দ কি ভাল সে কথা থাক। কিন্তু পরের জন্য তুই যে বুক দিয়ে পড়ে করিস, তোর অতি-বড় শত্রুও তা অস্বীকার করবে না। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তোর কাছে এসে পড়েছি।

হাসির উচ্ছ্বাস থামিয়ে রাধারাণী মুহূর্তে কঠিন হয়ে বলে উঠল, মামা, ভাগনী তোমার অসতী—কিন্তু খুনি নয়।

খুন? কাকে কে খুন করতে যাচ্ছে? মানুষ কোথায় এর মধ্যে যে খুন হবে?

ছোট-জা ছবির শরীর খারাপ বলে পেটের বাচ্চা নষ্ট করার কথা উঠেছিল। মণ্টু হবার সময়টা। ছবি তা কিছুতে হতে দেয় নি। মণ্টু তাই হতে পেরেছে, এমন দেবদুর্লভ ছেলে হয়েছে। এ কাহিনী ছবির কাছে শোনা। তাই মনে পড়ে গেল রাধারাণীর। বলে, আরতির গর্ভে যা এসেছে—তোমরা যদি খোঁচাখুঁচি না কর—শিশু হয়ে একদিন জন্ম নেবে। বড় হয়ে মানুষ হবে। স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি মামা, আমি তোমাদের খুনোখুনির মধ্যে নেই।

রাধির তো দায় নয়, তাই এসব সাধু সাধু বাক্য মুখে আসছে। মুখের দিকে তাকিয়ে হারাণ নিঃসংশয়ে বুঝলেন, অনুনয়-বিনয় করে অথবা টাকাপয়সার লোভ দেখিয়ে—কোন রকমেই হবে না। চোখে অন্ধকার দেখেন তিনি। মহকুমার মধ্যে বিশিষ্ট মানুষ—দু-কান পাঁচ-কান হতে হতে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে পড়লে মুখ দেখাতে পারবেন না তো কারও কাছে। মুখ নাই বা দেখালেন। কিন্তু আরতির পরে আরও তিনটে মেয়ে—তাদের কী হবে? কোনদিকে কূলকিনারা দেখেন না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে হারাণ একই ভাবে বসে আছেন একটা জায়গায়।

দেখা গেল, চোখের জল গড়াচ্ছে হাঁটু বেয়ে। রাধির কষ্ট হয়। একটুখানি ভেবে নিয়ে বলে, আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি মামা।

ভরসা পেয়ে হারাণ মুখ তুলে বলেন, কি?

আরতির বড়মামা ওকে তো কলকাতায় নিতে চাচ্ছিলেন। তাঁর বাসায় পাঠিয়ে দাও।

হারাণ বলেন, বুদ্ধিমতী হয়ে এটা তুই কি বললি রাধি? কুটুম্বর বাসায় কিছু কি চাপা থাকবে?

বাসা অবধি যেতে যাবে কেন? থাকবে শেয়ালদা স্টেশনে। কিম্বা কোন হোটেলে এক-আধ বেলার মতো—

হোটেল থেকে তারপরে?

হেসে ফেলল এবারে রাধি—হারাণের এই অবস্থার মধ্যেও। বলে, বিষয়-আশয় নিয়ে এত প্যাঁচ খেলে বেড়াও মামা, আর এই সাদা কথাটা মাথায় ঢোকে না? হোটেল থেকে চলে যাবে আমার সঙ্গে। যাবে তীর্থ করতে—কাশী যাবে আমার মায়ের কাছে। বুঝলে এবার?

আবার বলে, মায়ের শরীর খারাপ—আমারও মন টানছে কাশী যাবার জন্য। মায়ের কাছে গিয়ে থাকব। শুধু টাকার অভাবে পারছি নে। তা মানসম্ভ্রমের জন্য তুমিও তো অঢেল খরচ করতে রাজি। অসুখ ভাল হয়ে তারপর একদিন আরতি ফিরে আসবে। বিয়েথাওয়া দিও তখন মেয়ের। এখন লোকে জানুক, কলকাতায় মামার বাসায় গিয়ে আছে আরতি।

কাপাসদা'র লোকের হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল, রাধারাণী নেই। টুনিমণির কাছে প্রশ্ন করে পাওয়া গেল, তীর্থধর্মে বেরিয়েছে। ধর্ম না কচু! ডবকা ছুঁড়ি—এ বয়সে তীর্থ করতে যাবে কোন্ দুঃখে? এ লাইনের যারা, বুড়ো হয়ে যাবার পর তাদের তীর্থে মতি হয়। কিন্তু টুনিমণিকে আর বেশি জিজ্ঞাসা করলে তেড়ে ওঠেঃ তোমরাই সব খেদিয়ে তুললে মাসিকে। যেখানে খুশি যাক, তোমাদের কি?

খবর শুনে হীরক বুকে থাবা দিয়ে বলে, পাপ বিদেয় হল আমারই জন্যে। বুঝেছিল, না তাড়িয়ে এ লোক কিছুতে ছাড়বে না। গ্রাম জুড়ল রে বাবা!

ভগীরথ কিন্তু এত সহজে ছাড়ে নাঃ তীর্থ-টির্থ মিছে কথা। কোন মতলবে কোথায় গিয়ে উঠল বল দিকি?

চুলোয় যাকগে। কী দরকার আমাদের?

একা যায় নি, কারও ঘাড়ে চেপে গিয়েছে—এই বলে দিলাম। রাধির না হোক, সেই নাগর মশায়ের হদিশটা নিতে হবে।

উদ্যোগী লোকের অভাব নেই গ্রামে। খবর সংগ্রহের জন্য ঘুরছে। সঠিক তারিখটা বেরুল। সময়টা বেরুল—ভোররাত্রে পায়ে হেঁটে গিয়ে বাস ধরেছে। সেই ভোরবেলা কোন কোন নম্বরের বাস ছেড়েছে, গঞ্জের আপিসে গিয়ে খবর নাও। ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরের নাম বের কর। কণ্ডাক্টরের মনে পড়ল, একটি অল্পবয়সি মেয়ে গিয়েছিল বটে—কতজনেই তো যায়, কিন্তু ঝকঝকে রূপসী বলেই মনে পড়ে গেল। সঙ্গে ছিল বই কি মানুষ—খুব রোগা এক বৃদ্ধ লোক, মাথায় টাক। মিলছে?

নাগর নয়, রাধির মাতুল হারাণ মজুমদারই তবে। ভ্রষ্টা ভাগনী গ্রামের উপর কেচ্ছা করছে—হারাণ এসেছিলেন তাকে বিদায় করে দিতে। অঞ্চল মোটের উপরে তো একটাই। মানী মানুষ, তিলডাঙায় থেকে তাঁরও কি মুখ পুড়ছে না?

হীরক বলে, তার উপর আমি যে রকম আদাজল খেয়ে লেগেছিলাম—

ভগীরথ একটা নিশ্বাস চেপে নেয়ঃ আরে ভাই, তুমি হলে মরশুমি পাখি—দু-দিন এসেছ, আবার কলকাতায় গিয়ে উঠবে। তবু গ্রামের উপর একঘর ছিল। তারা আর টুনিমণি আছে—দেখে নিও, মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের উঠোনে কসাড় জঙ্গল ডেকে উঠবে মাস কয়েকের মধ্যে।

সতের

স্বৈরিণী মেয়েটাকে কাপাসদা'র মানুষ ভুলে গেছে। দশ বছর কেটেছে তারপর। ডাক্তারি পাশ করে হীরককান্তি গ্রামে এসে বসেছে। ভক্তিলতাও এখানে। টুনিমণি এখন ভক্তিলতার কাছে,—ভক্তিলতার ছেলেপুলে দেখে। ভক্তি বলেছে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে নার্সিং পড়াতে দেবে। ইতিমধ্যে বাংলা-ইংরেজি শিখে নিক একটু। তাই শেখে ভক্তিলতার কাছে। টুনি ছাড়া ভক্তিলতার একদিনও চলে না।

অনেকদিন আগে রাধি ভক্তিলতাকে এক চিঠি লিখেছিলঃ ভাই চাঁপাফুল, বাবা বিশ্বনাথ আর মা অন্নপূর্ণার পদতলে পড়ে আছি। বড় শান্তি। সকাল-সন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করি। পাপ ধুয়ে সাফ না করে ছাড়ছি নে। কিছুতে না। আবার যদি কখনো যাই, দেখতে পাবে তোমার চাঁপাফুল একেবারে নতুন মানুষ—

ভাল। এর চেয়ে ভাল খবর আর কি! ভক্তিলতা নতুন বউ হয়ে এল, সেদিন সকলের আগে গিয়ে পড়েছিল রাধি। স্বর্ণচাঁপার মুকুট গড়ে মাথায় দিল, চাঁপাফুল পাতাল। সেই অপরূপ রূপসী মেয়ের এই পরিণাম।

শোনা গেল, রাধারাণী ফিরেছে। মনোরমা মারা গেছেন। তারপরেও এত বছর যা-হোক করে চালিয়েছে। আর এখন কাশীতে থাকবার অবস্থা নেই। গাঁয়ে ফিরে এসেছে।

উঠেছে বাঁড়ুয্যেপাড়ায় নিজেদের বাড়ি।

সে বাড়ির কী দশা! পাগলি তারা একলা থাকে সেখানে। টুনিমণি কখনসখন মা'কে দেখতে যায়—ভক্তিলতাও একদিন তার সঙ্গে গিয়েছিল। এমনি মানুষ বড় আর ও-মুখো হয় না। পাড়া একেবারে ফাঁকা। মরেহেজে গেছে। আর ওই যে রব উঠেছে, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হবে– আগেভাগে কতক গিয়ে ওপারে ঘর তুলেছে। তারা কামারনী বড়ঘরে তালা ঝুলিয়ে সঙ্কীর্ণ সেই রান্নাঘরেই রয়ে গেছে। অত বড় ঘর লেপেপুঁছে পারে না। বুড়োমানুষের পক্ষে এই ভাল—রান্নাঘরের এক পাশে রাঁধাবাড়া, এক পাশে শোওয়া। একলা মানুষের কত আর জায়গা লাগে! খাওয়ার ভাবনা নেই—দেড় বিঘের ধান বর্গাদারে দিয়ে যায়। তার উপরে আম-কাঁঠাল নারকেল-সুপারি এটা-ওটা আছে।

এতকাল পরে রাধারাণী বাড়ি ফিরে এল। এসেছে দুপুরবেলা, খবর শোনা অবধি ভক্তিলতা ছটফট করছে। সেই যে চিঠি লিখেছিল—কী রকম নতুন হয়ে এল রাধি এই দশ বছরে? বড়ঘরটায় ইঁদুরে মাটি তুলে ডাঁই করেছে, দেখে এসেছিল—তার ভিতরে আছে সে কী অবস্থায়? কিন্তু বউমানুষ সকলের

চোখের উপর দিয়ে রাধি হেন মেয়ের কাছে হুট করে চলে যেতে পারে না। দিন গেল, রাত্রিটাও গেল—পরের দিন সকালবেলা হিঞ্চেশাক তুলবার ছুতোয় দীঘিতে গিয়ে সেখান থেকে লুকিয়েচুরিয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয় বাঁড়ুয্যের উঠোনে।

উঠোন আর কি—বড়ঘরের ছাঁচতলা অবধি হেড়াঞ্চি ও কালকাসুন্দের ঝোপ। খুব ব্যস্ত রাধারাণী। তারা-বুড়িও লেগে গেছে দেখি তার সঙ্গে। কাটারি দিয়ে তারা ঠুকঠুক করে জঙ্গল কাটে আর হাঁপায়। বড়ঘরে ওঠার মতো পথটুকু হলে যে হয়। তালা খুলে ফেলেছে বড়ঘরের—ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি এনে রাধি ইঁদুরের গর্তে ঢালছে। দুরমুশ করছে ঢেঁকির ছেয়া খুলে এনে। তুমুল ব্যাপার। এমনি সময় বড়লোকের বউ ভক্তিলতা এসে দাঁড়াল।

রাত কাটালে এরই মধ্যে নাকি চাঁপাফুল? কী সর্বনাশ! আমায় একটা চিঠি দিলে তো হত।

রাধি রান্নাঘরের দিকে আঙুল দেখায়ঃ ওইখানে তারা-দিদির পাশে পড়ে ছিলাম। কালকের রাত ভাল গিয়েছে, কিন্তু আজকে আর তা হবে না। সুনামের তো অন্ত নেই আমার! গাঁয়ে এসেছি সে খবর চাউর হয়ে গেছে—আজ থাকলে রান্নাঘরের ফঙ্গবেনে বেড়া রাতারাতি ভূতে উড়িয়ে নেবে। তারা-দিদির শাপ-শাপান্তে ঠেকাবে না। যেমন করে হোক সন্ধ্যের মধ্যে দেয়ালের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজায় খিল দেব।

তারপর হেসে উঠে বলে, চিঠি দিলে কী করতে ভাই চাঁপাফুল? তোমাদের বাড়ি জায়গা দিতে? ঘরে না হোক গোয়ালে দিলে নাকি দোষ হয় না। কিন্তু কর্তার যা রাগ আমার উপর—পারলে আমায় দাঁতে পিষে চিবোন। গি বাড়িয়ে আমার জন্য কিছু করতে গেলে খিটিমিটি বেধে যাবে তোমাদের মধ্যে। সেইজন্য কিছু জানাই নি।

ভক্তিলতা হয়তো বা লজ্জা পেয়েছে স্বামীর ওইরকম মনোভাবে। জবাব না দিয়ে একনজরে সে রাধারাণীর ধূলোমাটি-মাখা ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে বলে ওঠে, কী মন্তর জান ভাই চাঁপাফুল—দশ বছরে যে দশটা দিনেরও বয়স বাড়ে নি!

রাধি বলে, আর কিছু নেই আমার ভাই—আছে এই সম্বলটুকু। কিন্তু তারই জন্যে তো টিকতে পারি নে। যেখানে যাই, মাছির মতন লোক ঘোরে। দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকতা শুনে ফিরছি, লোক পিছু নিয়েছে। যত বড় দেবস্থান, নোংরামি তত বেশি। তখন মা বেঁচে, যেন পর্বতের আড়ালে ছিলাম। কেউ কিছু পেরে ওঠে নি। সেই যা তোমাকে লিখেছিলাম, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। মাকে বলতাম, নাইট্রিক-এসিডে মুখ পোড়াবার কথা বলতে—কই? মায়ায় পড়ে পারছ না। টাকাপয়সা শেষ হয়ে গেছে, মরবার আগে এই কাজটি অন্তত করে যাও। তাহলে অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

ভক্তিলতার এসব কিছুই কানে যায় না। মুগ্ধ স্বরে সে আগের কথাই বলে চলেছেঃ পশ্চিমের জলে হাওয়ায় শতদল-পদ্ম হয়ে ফুটে এসেছ। মুনির মন টলে যায়। মেয়েমানুষ না হলে আমিও তো পিছু নিতাম, জড়িয়ে ধরতাম একেবারে।

রাধি হেসে তাড়া দিয়ে উঠলঃ চুপ! অমন করে চেঁচিয়ে বলে! ছেলের মা আমি যে এখন! ও হরি, তা বুঝি বলি নি—ছেলে নিয়ে এসেছি। রান্নাঘরে শুয়ে আছে—শরীরটা ভাল নয় বলে উঠতে দিই নি। ছেলের কানে এসব গেলে বড় লজ্জা।

সাপ দেখে মানুষ যেমন ত্রস্ত হয়, ভক্তিলতা তেমনিভাবে বলে, তোমার ছেলে—ছি-ছি, কী বল তুমি!

রাধি অভিমানের সুরে বলে, আ আমার কপাল! ছেলে বাড়িতে এল—কোথায় সকলে উলু দেবে শাঁখ বাজাবে—তা নয়, আমার আপন মানুষ হয়ে তুমি সুদ্ধ ছি-ছি করছ। ছেলে তোমায় দেখাব না চাঁপাফুল। যাও, চলে যাও তুমি—

ভক্তিলতা চাপা গলায় বলে, অন্য কাউকে বলেছ নাকি এই সব?

কেন বলব না? বাড়িতে পা দিয়েই তারা-দিদিকে বললাম। ভগীরথ-দা এসে জিজ্ঞাসা করল, কার ছেলে? তাকেও বলেছি। ছেলেকে ছেলে ছাড়া আর কি বলব?

ভক্তিলতা রাগ করে বলে, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার।

রাধারাণী নিরীহভাবে বলে, সোনা হেন ছেলেটা মা-মা -করে আঁচল বেড়াচ্ছে, বলতে তো হবে একটা-কিছু।

বলতে পারতে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। গঙ্গার ঘাটে ফেলে গিয়েছিল।

রাধি বলে, তাতে কী হত? পেটের ছেলে ফেলে দিয়ে যায় কোন কুমারী-মা, নয়তো কোন বিধবা-মা—আমারই মতন। তাহলে তো একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো।

ফিক করে হেসে বলে, কোন লাভ হত না। আমার যা সুনাম, কেউ ওকথা বিশ্বাস করত না। উল্টে ছেলে আমার দুঃখ পেত সেই কথা শুনে। মন গুমরে বেড়াত। মা বলা হয়তো বন্ধ করে দিত। তার চেয়ে মরণ হোক না আমার। নিজে তুমি ছেলের মা—ভেবে দেখ না, তোমার ছেলে নিয়ে যদি এমনি কথা ওঠে!

স্তব্ধ হয়ে গেল রাধি মুহূর্তকাল। হাতের কাজ বন্ধ। বলে, এই ছেলে বাঁচিয়ে তুলতে যত কষ্ট করেছি, সংসারের কোন মা তা করতে পারে জানি নে। সেই যা তোমায় লিখেছিলাম—সত্যি সত্যি শান্তিতে ছিলাম আমি, পাপের ময়লা মন থেকে ধুয়ে-মুছে গিয়েছিল। কিন্তু মা মরার পর একেবারে অচল অবস্থা। উপোস যায় একদিন দু-দিন। নিজের কিছু নয়, কিন্তু ছেলের

শুকনো মুখ দেখে পাগল হয়ে উঠি, কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যে রূপের ব্যাখ্যান করছ, তাই বেচে বেচে শেষটা চাল-ডাল তেল-নুন কিনতে হত।

ভক্তিলতা পাথর হয়ে শুনছে। বলতে বলতে রাধির দু-চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। আঁচলে মুছে ফেলে বলে, দু-খানা গয়নাগাটি যদি থাকত, তাই বেচতাম। নেই তা কি করব—রূপ বেচে বেচে ছেলে খাইয়েছি। সেই ছেলে বড় হয়ে গেছে এখন, বোঝে সব। যদি কিছু টের পায়, তখন আমার গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। সেই ভয়ে পালিয়ে এলাম। বিঘে দেড়েক ধান-জমি আছে, আওলাতপশার কিছু আছে, দুঃখে-কষ্টে চালাব। তারপর আমার ছেলে মানুষ হয়ে গেলে আর ভাবনা কি! পায়ের উপর পা রেখে ছেলের ভাত খাব। দশ বছর বয়স হয়েছে—মরি মরি করে আর আটটা দশটা বছর।

আরও খানিক পরে ভক্তিলতা উঠল। দীঘিতে নেমে কিছু হিঞ্চেশাক তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। রাধারাণী তার হাত জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বলে, হীরক-দা বাড়ি রয়েছে—সেই আমার বড় শক্তি। তাকে বলে এই কাজটা কোরো চাঁপাফুল, নচ্ছার মানুষ এ-বাড়ির ছায়া না মাড়ায়! ছেলের সামনে কেউ কেলেঙ্কারি না করে বসে! আর দশটা গৃহস্থের মতন শান্তিতে ঘরবসত করব আমি।

ছেলের নাম দীপক। নাম রাখায় যখন পয়সা-খরচের ব্যাপার নেই, তখন একটু জ্বলজ্বলে নাম হবে না কেন? ভক্তিলতা চলে গেল, দীপক ঘুমুচ্ছে এখনও। কাশী থেকে বেরিয়ে পুরো তিনদিন পথে পথে—ছেলেমানুষের উপর দিয়ে বড্ড ধকল গেছে। আহা ঘুমোক—খুব খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

দুপুরবেলা খাওয়ার সময় হল, দীপক তখনো ঘুমুচ্ছে। রাধি গায়ে হাত দিয়ে দেখে, একটু যেন গরম। সন্ধ্যা নাগাদ স্পষ্ট জ্বর হল। বড়ঘরে তক্তাপোশের উপর শুইয়ে দিয়েছে। শয্যার পাশে রাধারাণী জেগে বসে। আলো জ্বলছে সমস্ত রাত। নতুন জায়গায় ভয়-ভয় করছে; তার উপর রোগির অবস্থা কখন কি রকম হয়, চোখে না দেখে সোয়াস্তি পাবে না। পাগলি তারা যথারীতি রান্নাঘরে। বলেছে বটে, দরকার পড়লে ডাকিস আমায় রাধি। কিন্তু কী বোঝে, আর কী করবে ওই মানুষ!

পরদিন সকালে জ্বরটা কিছু কম—একেবারে বিজ্বর নয়। দুপুর থেকে হু-হু করে আবার জ্বর বাড়তে লাগল। দেহ যেন তপ্তখোলা—ধানের মুঠো ছাড়লে বোধ করি খই হয়ে ফুটবে। অনেক ডাকাডাকিতে উঁ করে একটু সাড়া দেয়, টকটকে-রাঙা চোখ মেলে অর্থহীন ভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। সেই চোখ ঘোরানো দেখে রাধির প্রাণে আর জল থাকে না। কী করে এখন, কার কাছে

যায়! পাশ-করা ডাক্তার হীরককান্তি গাঁয়ের উপরে—সে এসে দেখে যায় যদি। হীরকের পা জড়িয়ে ধরবেঃ আমার দোষঘাট যা-ই থাক হীরক-দা, দীপক তো কোন দোষ করে নি—

ছেলের কাছে তারাকে বসিয়ে রাধারাণী পায়ে পায়ে চলে গেল সেই মিত্তির পাড়া অবধি। অপথ-কুপথ ধরে যাচ্ছে—মানুষের সামনে না পড়ে। তবু দেখে ফেলে দু-একজনে। কথা বলে না, বিস্ময়-ভরা চোখে রাধির দিকে তাকায়। চেনেই না যেন রাধিকে—নতুন মূর্তি ধরে বুঝি সে এবার গাঁয়ে উঠেছে।

তড়িৎকান্তির বাড়ি ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। অনেক মানুষ বৈঠকখানায়। কথাবার্তা যৎসামান্য—হুঁকো চলছে, গড়গড়া চলছে। হতভম্ব হয়ে রাধারাণী দাঁড়িয়ে পড়েছে। টুনিমণি এমনি সময় হনহন করে বেরিয়ে এল, এলুমিনিয়মের দুধের পাত্র হাতে। জিজ্ঞাসা করার মানুষ পাওয়া গেল একজন। রাধি কাছে এসে বলে, কেমন আছিস টুনি? বাড়ি এলাম, তা একবার চোখের দেখা দেখতেও গেলি নে?

টুনিমণি অবাক হয়ে বলে, তুমি এ জায়গায় কেন মাসি?

রাধি বলে, ছেলের বড্ড অসুখ। চিকিচ্ছের জন্যে ডাক্তারের বাড়ি আসব না তো যাই কোথা বল্।

বৈঠকখানার দিকে চকিত দৃষ্টি হেনে টুনিমণি বলে, তোমার মুণ্ডপাতের জন্য লোক ডাকাডাকি হয়েছে। বিচার করতে বসেছে ওই যে সব।

রাধি বলে, আমি তো খারাপ আছিই। সেবারেও ছিলাম। সেবারে লোক ডাকাডাকি হয় নি—নতুন আবার কী হল রে?

সেবারের মতন একলা যদি থাকতে, সকলে ক্ষমাঘেন্না করে নিত। কিন্তু ছেলে নিয়ে এসেছ, বিধবা মানুষ হাঁকডাক করে বলছ নিজের ছেলে তোমার—

ব্যস্ত হয়ে বলে, চল এখান থেকে। যোগানের দুধ দেয় নি এ-বেলা, দুধ আনতে যাচ্ছি। যেতে যেতে সব বলব।

মানুষগুলিকে রাধারাণী একবার ভাল করে দেখে নেয়। তড়িৎকান্তি নিজে আছেন। সুঁচোল-নাক বিপুলদেহ ওই যিনি—বসার রকম দেখে বোঝা যায়, কাশীনাথ তর্কতীর্থ ছাড়া কেউ নয়। আরও সব বিশিষ্টেরা আছেন। গাঁয়ের যত পাকা পাকা মাথা একসঙ্গে মিলে বিধান দিতে বসে গেছেন।

টুনিমণি বলে, শুনতে পাচ্ছি মাসি, তোমায় একঘরে করবে। ধোপা-নাপিত বন্ধ। মানুষজন পা ফেলবে না তোমার বাড়ি।

মানুষ যাবে না, তবে তো বেঁচে যাই। মাতব্বর মশায়দের পাদোদক খাব তাহলে আমি। কিন্তু সে হবার নয় রে টুনি—

বলতে বলতে রাধারাণী কেঁদে ফেলেঃ কালও নিশিরাতে উৎপাত করে গেছে, দাওয়ায় উঠে কবাটে ঠুকঠুক করেছে। সেই আগেকার মতন।

আবার বলে, মানুষজন না যাক, ডাক্তারও কি যাবে না আমার বাড়ি? রোগা ছেলের মুখে এক ফোঁটা অষুধ পড়বে না? হীরক-দা'কে তাই বলতে এসেছিলাম।

টুনিমণি ঘাড় নাড়েঃ বললে কিছু হবে না। উল্টে গালিগালাজ খাবে। ডাক্তারবাবু নাম শুনতে পারে না তোমার। হোমোপাথি পূর্ণ জোয়ান্দারও যাবে না, মাতব্বরদের ভিতর সে একজন। তুমি বরঞ্চ যাদব কবরেজের কাছে চলে যাও। মানুষটা ভাল, মায়াদয়া আছে।

যাদব কবিরাজ মানুষটা কে—এই গ্রামেরই মেয়ে, তবু রাধারাণী ভেবে ঠিক করতে পারে না। নতুন বসত বুঝি?

টুনিমণি সমঝে দিলঃ নতুন কেন হবে—চৈতন ঘরামির বাপ যাদব। আগে ওরা ঘরামির কাজ আর ক্ষেতখামার করত। তারপর চৈতন মারা গেল, জমাজমি সব নিলেমে উঠল। অত বড় সংসার চালাতে হবে তো—যাদব সেই থেকে কবিরাজি ধরেছে। যাদব-ঘরামি নয় এখন, যাদব-কবরেজ।

বলে, তা চিকিচ্ছে কিন্তু মন্দ করে না মাসি। দু-চারটে সারেও দেখেছি।

টুনিমণি বাঁয়ে বেঁকল। তাকে দরকার নেই—কবিরাজ-বাড়ি রাধি এখন বুঝতে পেরেছে। কবিরাজ বাড়িতেই ছিল, খড়ম খটখট করে দাওয়ায় জল-চৌকিতে এসে বসল। সমাদর করে ডাকেঃ এস মা রাধারাণী। উঠে বোসো এখানে। খবর কী?

রাধি তেমনি উঠানের উপর দাঁড়িয়ে বলে, আমার ছেলের বড্ড অসুখ কবিরাজ মশায়।

যাদব বলে, ছেলে নিয়ে বাড়ি এসে উঠেছ, শুনেছি বটে। শুনতে কারো বাকি নেই এদিগরে। আহা-হা, কী অসুখ করে বসল তোমার ছেলের?

আমি কী বুঝি, আর কী বলব। দেখেশুনে যে রকম বোঝ চিকিচ্ছে করবে। সেই জন্যে ডাকতে এসেছি।

কবিরাজ জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, চিকিচ্ছে আলবৎ করব। কাকে ডরাই? কায়েত-বামুনরা ঘোঁট পাকাচ্ছেন—ভারি ভারি ফিকির করছেন তোমায় জব্দ করবার জন্য। আমার কি? ওই মশায়দের বাড়ি গেলে আমায় তো চাটকোল পেতে বসতে দেবেন, আমি কেন ঘোঁটে থাকতে যাব? রোগি পেলেই অষুধ দেব, তা সে যে-ই হোক।

রাধি কৃতার্থ হয়ে বলে, চল তবে একটিবার।

উঁহু, বাড়ি যেতে পারব না। ওইটি মাপ করতে হবে। রোগি এখানে আনতে পার ভাল, নইলে তোমার মুখে শুনে যতদূর যা হয়—

রাধি বলে, কিন্তু ঘোঁটের বাইরে তো তুমি কবিরাজ মশায়।

যাদব বলে, তাই তো অষুধ দিয়ে দিচ্ছি। থাকলে কি দিতে পারতাম?

একটুখানি ইতস্তত করে বলে, তবে খুলেই বলি। তোমার বাড়ি গেলে পরিবার কুরুক্ষেত্তোর করবে। মানে নির্বোধ মেয়েমানুষ তো, নানান কথা শুনতে পাচ্ছে তোমার নামে—

সত্তর বছরের বুড়োমানুষটাকে বাড়ি নেওয়া গেল না। বামুন-কায়েত মাতব্বরদের সে গ্রাহ্য করে না—কিন্তু রাধির বাড়ি গেলে কবিরাজের বউ ওই খুনখুনে বুড়িটা নাকি মাথা-ভাঙাভাঙি করবে। বউয়ের ভয়ে যেতে পারল না। তবে আর কী উপায়? লক্ষণ শুনে বিচার-বিবেচনা করে কবিরাজ গোটাকতক রাঙাবড়ি দিল--মৃত্যুঞ্জয় রস। মৃত্যুকে করতে জয় নাম হইল মৃত্যুঞ্জয়—পানের রস আর মধু দিয়ে মেড়ে প্রাতে এক বড়ি, বৈকালে এক বড়ি খাইয়ে যাও, জ্বর আরাম হবে।

তিনদিন এমনি গেল। জ্বর কমে না। পেটে আঙুলের ঘা দিয়ে দেখে, ঢপঢপ করছে। ভয়ে রাধি কাঁটা। ক্রমেই তো খারাপের দিকে যাচ্ছে। পাগলের মতো ছুটে ঠাকুরবাড়ি চলে যায়। তখন মনে পড়ল, মন্দিরে ঢুকতে পারবে না তো। বাইরের ইটের রোয়াকে মাথা কোটেঃ গোপাল, দেশদেশান্তর থেকে তোমার পায়ে ছেলে নিয়ে এসেছি--ওকে আরোগ্য করে দাও। দীপক ছাড়া কেউ নেই আমার।

অনেক রাতে একটু বুঝি ঘুম এসে গিয়েছিল দীপকের পাশে বাঁকা হয়ে শুয়ে—দীপকের উত্তপ্ত পিঠে হাত রেখে। স্বপ্নে দেখে, সদাহাস্যময় বংশীবদন ঠাকুর ধমক দিচ্ছেনঃ একলা মানুষ--কোনরকম ঝঞ্চাট ছিল না, হেসে-খেলে আরামে থাকতিস। পরের আপদ সাধ করে কুড়িয়ে আনলি, মর এখন ছটফট করে।

সত্যি তাই। গর্ভধারিণী যে মা, তারই কাছে আপদ হল নিজের ছেলে। আহা, দীপকের কপাল নিয়ে কেউ যেন দুনিয়ায় না আসে! ভাবতে গিয়ে রাধির চোখ ভরে জল এল। ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলায়। ইস, হাত ছোঁয়ানো যায় না—হাত যে পুড়ে যাচ্ছে।

ভক্তিলতা টুনিমণির কাছে খবর পেয়েছে। ক'দিন ধরে ফাঁক খুঁজছিল। এবারেও সেই পুরানো কৌশল—হিঞ্চেশাক তুলতে এল দীঘিতে। সেখান থেকে ধাপ আর পচা-কাদা ভেঙে ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাধির উঠোনে। উঠোন থেকে ঘরের মধ্যে।

ছেলের পাশে বসে রাধি পাখা করছে। ডান হাতে পাখা, বাঁ হাত কপালে ঠেকিয়ে দেখছে মুহুর্মুহু। একবার মনে হয়, কমেছে জ্বর। কমেছে বই কি—হ্যাঁ, তাই। কবিরাজের ওষুধে কাজ হয়েছে। পরক্ষণে সন্দেহ হয়, কপালের তাপ তো যেমন তেমনি।

এমনি সময় ভক্তিলতা। ঘরে ঢুকে ভক্তিলতা সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে। তবু খুট করে একটু শব্দ হয়, সেই শব্দে রাধারাণী মুখ তোলে। কাল ঠাকুরের কাছে মাথা কুটে এল, নিশ্চয় সেই জন্যে গোপাল পাঠিয়েছেন। ব্যাকুল কণ্ঠে রাধি বলে, চোখে আঁধার দেখছি চাঁপাফুল। আমি কী করব?

নির্জন সর্বত্যক্ত এই বাড়ির মধ্যে একাকী মা রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসে আছে। চোখ বসে গিয়েছে—কতদিন অনাহারে আছে যেন, কত রাত্রি ঘুমোয় নি। ছেলেপুলের মা ভক্তিলতাও। রোগির গায়ে হাত দিয়ে বলে, কই, গা তেমন গরম কোথায়? মনের তাড়সে তুমি জ্বর দেখছ। প্রায় তো সেরেই গেছে, পরশু-তরশু ভাত দিতে পারবে।

রাধারাণী নির্বোধ নয়, আশার কথায় তবু যেন অবুঝ হয়ে যায় মুহূর্ত-কাল। মুখে হাসির ঝিলিক ফোটে। মা ভোলানো এত সোজা! জ্বর এমন-কিছু নয়—তারও এবার সেই রকম মনে হচ্ছে।

ভক্তিলতা বলে, আমি আছি এখানে, চান করে কিছু মুখে দিয়ে এস চাঁপাফুল। এক-কাপড়ে অমন ঠায় বসে থাকতে নেই। অলক্ষণ। দেখতেও খারাপ—কত বড় কী যেন একটা হয়েছে। কথা না শোন তো এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

বলতে বলতে অবশেষে রাধি উঠল। স্নান করে গুড়-নারকেল মুখে দিল একটু। দীপক অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ভক্তিলতা বলে, নিজের সর্বনাশ নিজেই বেশি করেছ চাঁপাফুল। তাই এমন একা। এতবড় গাঁয়ের মধ্যে থেকে রোগা ছেলের পাশে একটু বসবার মানুষ পাও না। বার্লি ফুটিয়ে দেবার একজন কেউ নেই।

রাধারাণী কাতর চোখে তাকালঃ আমার দোষ নয় চাঁপাফুল—বিধাতা-পুরুষের। হাড়-মাস-চামড়ার উপরটা যে এমন করে সাজাল। এর উপরে কোনদিন তো আমি এক টুকরো সাবানও ঘষি নে। ধুলো-মাটি কালিঝুলি মেখে বেড়াই। পোড়া রূপ তবু যায় না। জীবন-ভোর এর জন্য আমার হেনস্থা। এঁটোপাতার মতো কুকুরে এসে চাটে।

গলা ধরে আসে। চুপ করে রাধি একটুখানি সামলে নেয়ঃ আমার কত ঘেন্না যে এই দেহের উপরে, তুমি জান না চাঁপাফুল। তোমার আসার অনেক আগের এক ব্যাপার—ডানপিঠেমি করে বেড়াই, সেই সময়ে জোয়াদ্দারপাড়ার শেফালী চিঠি লিখেছিল গঙ্গেশের নামে। কিছুই নয়—ছোট মেয়ে ঝোঁকের মাথায় করে বসেছিল। কী রাগ আমার তাই নিয়ে! গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করেছিলাম, থুতু দিয়েছিলাম তার গায়ে। সেই সব কথা আজ ভাবি। নিজের গায়ে যে থুতু দেওয়া যায় না—নইলে তাই আমি করতাম সকাল-বিকাল। কিন্তু চেষ্টাও তো কম করি নি—মানুষে কিছুতে রেহাই দেয়

না। মা মরে গেলে ঠিক করলাম, ঝিগিরি রাঁধুনিগিরি করে খাব। যেখানে কাজ করতে যাই, বাড়ির পুরুষ ছোঁক-ছোঁক করে। রাজি না হলে ছুতোনাতায় তাড়িয়ে দেয়। ওই একটা জিনিস ছাড়া কেউ আমায় সিকি-পয়সা সাহায্য দেবে না।

ভক্তিলতা স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। আগাগোড়া শুনে নিয়ে বলল, সকলের চেয়ে বড় দোষটা কোথায় জান চাঁপাফুল? নিরুপায় হয়ে যা করবার করলে, কিন্তু বাইরে একটা মিথ্যার পালিশ দিয়ে বেড়াতে জান না তুমি। দুনিয়ার তাই যে নিয়ম। যে যা-ই করুক, মুখে বলে না কেউ। সব মানুষ অভিনয় করে বেড়াচ্ছে। এই যে তোমার ছেলের ব্যাপার-- সেদিন বললে, বানানো কথা বিশ্বাস করত না কেউ। না করুক, কানাঘুষো চলত। তবু যে নিজের একটা সাফাই বানিয়ে বলেছ, সমাজের ইজ্জত রক্ষা হত তাতে। কিন্তু তুমি একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে খালাস - দীপক তোমারই ছেলে, স্বামী না থেকেও ছেলে হয়েছে। দশেধর্মে এত বড় চোট মানিয়ে নিতে পারে না।

অনেকক্ষণ কাটল। সুখদুঃখের অনেক কথা হল। এবারে উঠবে ভক্তিলতা। বলে, মন এখানে পড়ে রইল চাঁপাফুল। ফাঁক করতে পারলেই আবার আসব।

রাধি বলে, থার্মোমিটার হলে জ্বরটা ঠিক ঠিক বোঝা যেত। কোথায় পাই? থাকলেও পাড়াপড়শি কেউ দেবে না। গঞ্জেও পাওয়া যায় না শুনলাম, ব্লাকে চলছে।

ভক্তিলতা বলে, ডাক্তারের বাড়ি থার্মোমিটার আছে। দেব পাঠিয়ে।

সাগ্রহে রাধি বলে, আমি যাব তোমার সঙ্গে? ভিতরে যাচ্ছি নে, বাইরে কোনখানে দাঁড়িয়ে থাকব।

লোকে দেখে ফেলবে, জানাজানি হয়ে যাবে। তাহলে তো টুনিকে দিয়েও পাঠাতে পারতাম। তোমার কাছে আসি, কেউ না টের পায়! পাঠাবার জন্যে ভাবনা কি—খোদ ডাক্তারই নিয়ে আসবে। শুধু টেম্পারেচার নিলেই তো হবে না, দেখেশুনে ওষুধ দিয়ে যাবে।

রাধি অবাক হয়ে বলে, আসবেন হীরক-দা? বলছ কি চাঁপাফুল, পারবে তুমি পাঠাতে?

ভক্তিলতা সহজ ভাবে বলে, তা কেন পারব না? কিন্তু কী রকম ব্যস্ত মানুষ জান তো—আসতে রাত হবে।

রাধি বলে, কিম্বা ইচ্ছে করেই রাত করে পাঠাবে।

সায় দিয়ে ভক্তিলতা বলে, ঠিক তাই। সমাজের ইজ্জতটা বাঁচিয়ে রেখে। বাড়ির লোকজন পাড়ার লোকজন ঘুমলে তবে পাঠিয়ে দেব। এসে দুয়োর ঠেলবে, তখন ভয় পেয়ে যেও না কিন্তু ভাই।

রাতের ভয় কী দেখাও চাঁপাফুল? মচ্ছব তো তখনই। পেঁচা ডাকে, বাদুড় ওড়ে, সাপ বেরোয় গর্ত থেকে—আমার উঠোনে তখন মানুষের দাপাদাপি। কাপাসদা এসে গোড়ায় একদিন-দুদিন ভাল ছিল—আবার লেগে গেছে। ছেলের এত বড় অসুখ, তাই বলেও ওরা দয়া করে না।

নিশ্বাস ফেলে বলে, হীরক-দা আসবেন, এ আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না। কী ছিলাম, কী হয়েছি—তাঁর বড় ঘেন্না আমার উপরে! ওই একটা মানুষই দেখেছি ঘেন্না করে মুখ ফিরিয়ে নেন। ঘেন্না করেন, তবু কিন্তু বড় ভাল লাগে।

স্বামী-গর্বে ভক্তিলতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেঃ তুমি বলে নয় ভাই। ও মানুষ অমনি। ঘেন্না বল তুচ্ছতাচ্ছিল্য বল, সব মেয়ের সম্পর্কে। একলা এই আমি ছাড়া কারও দিকে তাকায় না। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যাকে বলে—সত্যযুগের মানুষ। কিন্তু আমি বললে ঠিক সে চলে আসবে। না এলে তোমার ছেলের চিকিচ্ছে হবে না যে! হাতুড়ের উপর ফেলে রাখতে আমি দেব না।

হেসে উঠে আবার বলে, চাঁপাফুল ভাই, অনেক ক্ষমতা তোমার শুনতে পাই। লোকে বলে, অনেক মাথা তুমি চিবিয়ে খেয়েছ। ওর মাথায় কামড় দিতে যেও দেখি। দাঁত তোমার ভেঙে যাবে।

হাসতে হাসতে ভক্তিলতা বেরিয়ে গেল।

= আঠার =

প্রস্তাব শুনে হীরক অবাক হয়ে যায়। ভক্তিলতা ঝগড়া করছেঃ ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে তুমি গ্রামের উপর থাকতে? মানুষ হিসাবে পছন্দ না কর, ডাক্তার হিসাবে যাও। চাঁপাফুল যদি দু-টাকার জায়গায় দশ টাকা ভিজিট দিতে পারত, তখন সুড়সুড় করে চলে যেতে।

রাগ দেখে তখন হীরক হাসেঃ আমি যেতে চাইলেও তোমারই তো বাধা দেওয়া উচিত। আর দশটা পতিপ্রাণা সতীর মতো। ওই রাধারাণী, জান, আমাদের সকলের মুখের উপর একদিন জাঁক করেছিল, কামরূপ-কামাখ্যার মন্তর জানে সে। তাই যদি সত্যি হয়—গুণ করে যদি ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয়!

ভক্তিলতাও হেসে ফেলেঃ তাই কী আর হবে শেষ অবধি? কপাল বড় পাথরচাপা। কতবার কত রকমের আশা করি, শেষ অবধি ভেস্তে যায়। চাঁপাফুল ভারি কাজের মেয়ে—নিঃসহায় একটা মেয়েলোক দু-খানা হাতে ছেলের জন্য যা করছে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। মানুষ হও ভেড়া হও, তার কাছে সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না। আরামে থাকবে। আমি তার সিকির সিকিও পারি নে। তোমার দায়ে নিশ্চিন্ত হলে ছ-মাস তখন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব।

হীরক বলে, জানি গো জানি। ছুতো খুঁজছ। এক যুগ বিয়ে হয়েছে—এক পুঁথি কতবার পড়তে ভাল লাগে? কিন্তু আমাকে না সরিয়ে তুমি নিজেই ইচ্ছে মতন সরে গেলে পার। মানা করতে যাব না।

ভক্তিলতা ঘনিষ্ঠ হয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যাঁ গো, বলে দাও না কার সঙ্গে সরে পড়ব? চাঁপাফুল আমার চেয়ে অনেক--অনেক ভাল। রূপে-গুণে ভাল, বুদ্ধি-সাহসে ভাল। তোমার তো এত বন্ধুবান্ধব—সেই কলেজের আমল থেকে দেখছি—চা করতে করতে হাত পুড়িয়ে কাল করে ফেললাম, তার মধ্যে একজনও তো ভাল দেখলাম না তোমার চেয়ে। নিয়ে এস না ভাল দু-একটা জুটিয়ে—পুরানো ছেড়ে নতুন পুঁথি পড়ে দেখি।

স্বামীকে রাজি করিয়ে ভক্তিলতা চুপিসাড়ে দরজা খুলে দিল। বাড়ির লোকে, পাড়ার লোকে ঘুণাক্ষরে না জানতে পারে।

বড়ঘরের দাওয়ায় উঠে হীরক দরজা নাড়ল। কথা আছে তাই। আনাড়ি হাত—অন্যেরা যেমন করে, সে রকম নয়। চিনে নিয়ে রাধি তাড়াতাড়ি খিল খুলে দেয়।

হেরিকেন জ্বলছে। একটা পুরানো পোস্টকার্ড চিমনির গায়ে গুঁজে দেওয়া—দীপকের চোখে আলো না পড়ে। মেঘে ভরা আকাশ। বৃষ্টি নেই,

বিষম গুমট। খুব ঘামছে ছেলেটা—গরমের জন্যে। কিন্তু রাধারাণী তা মানবে না—জ্বর রেমিশন হচ্ছে বলেই ঘাম। হাতপাখা রয়েছে হাতের কাছে, গরমে আইঢাই করছে। তবু পাখাটা নাড়বে না, হাওয়া লেগে দীপকের ঘাম পড়া পাছে বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুর গোপাল, পাঁচ পয়সার ভোগ দিয়ে আসব খোকার জ্বর ছেড়ে গেলে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বক করে মনে পড়ে যায়, ঠাকুরবাড়ি ঢোকা তার মানা হয়ে গেছে। নাই বা গেল গোপালের কাছে—কেউ যখন থাকবে না, চুপি চুপি রোয়াকের উপর ভোগের বাতাসা রেখে আসবে। পুরুত হাতে করে না দিলেও অন্তর্যামী ঠাকুর নিয়ে নেবেন।

এই সব ভাবছে, এমনি সময় হীরক এল। কাল গগলস পরেছে চোখে, বৃষ্টি নেই তবু বর্ষাতিতে আপাদমস্তক ঢাকা। একটি কথা না বলে রাধির দিকে না তাকিয়ে থার্মোমিটার দীপকের জিভের নিচে দেয়। হাতঘড়ি দেখছে। আলোর কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরিখ করে দেখে থার্মোমিটার আবার খাপে ঢুকিয়ে রাখে।

কী মানুষ, একটি কথা নেই এতক্ষণের মধ্যে! তখন রাধিকেই বলতে হয়, কত দেখলে?

তিনের উপর।

জবাব দিচ্ছে, মুখের দিকে তাকায় না। রাধি আকুল হয়ে বলে, কী হবে হীরক-দা?

হীরক বলে, কয়েকটা প্রশ্ন করছি। যা বলবার তারপরে বলব।

রোগের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন। পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে হীরক জবাব লিখে নিচ্ছে। শেষ হলে নিবিষ্ট হয়ে ভাবছে সেই লেখা-কাগজের দিকে চেয়ে।

রাধারাণী বলে, কবে সেরে উঠবে খোকা?

গম্ভীর নিস্পৃহ কণ্ঠে হীরক বলে, এখন কিছু বলা যায় না। টাইফয়েড—আসল নয়, প্যারাটাইফয়েড। তা-ও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আর দু-চারদিন না গেলে।

ডাক্তারি-ব্যাগ নিয়ে এসেছে। এটা-ওটা মিশিয়ে শিশিতে ঢেলে ওষুধ বানায়। বলে, এই ওষুধ চলবে আপাতত। কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা ওষুধে নয়। শুশ্রূষাই হল আসল। মন বোঝে না, সেইজন্য এক দাগ দু-দাগ ওষুধ খাওয়ানো।

ওষুধ রাধির হাতে দেয় না, ছুঁতে হয়তো বাধছে, মেজেয় রেখে দিল। থার্মোমিটার তাকের উপর নিয়ে রাখল। বলে, অসাবধানে পড়ে গিয়ে না ভাঙে। টেম্পারেচার ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাখতে হবে। ও, ঘড়িও তো নেই—

নিজের হাতঘড়িটা খুলে থার্মোমিটারের পাশে রেখে আসে। পথ্য কখন কি দেবে, জ্বর বেশি হলে মাথায় কি ভাবে জল ঢালবে ইত্যাদি আনুপূর্বিক বুঝিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হীরক। বলে, কাল নয়—পরশু আসব এই সময়।

রাধি অনুনয় করে বলে, কালও একটিবার এস হীরক-দা।

না, দরকার হবে না—

গটমট করে হীরক বেরিয়ে গেল। নীরস কাটা-কাটা কথা। রাধি রাগে গরগর করছে। আবার আনন্দও হয় ভক্তিলতার ভাগ্যে। জাঁক করবার মতো স্বামী পেয়েছে। দেহভরা রাধির এত রূপ—চোখ তুলে একবার তাকাল না। এমনি দেমাক, এতখানি দৃঢ়তা। হীরক নাম তো সত্যি সত্যি এক হীরের টুকরো। আদাড়ে-আস্তাকুড়ে যেখানে খুশি ফেলে রাখ—মরচে ধরবে না, জ্যোতি কমবে না।

একদিন বাদ দিয়ে অমনি নিশিরাত্রে হীরক রোগি দেখতে এল আবার। প্যারাটাইফয়েডই বটে, আশঙ্কার কিছু নেই, তবে সতর্ক থাকতে হবে। দুর্বল শরীরে ঠাণ্ডা লেগে গিয়ে নিউমোনিয়া না ধরে।

আবার ক'দিন পরে এল। এমনি চলছে। জ্বর একেবারেই থাকে না সকালবেলা। সন্ধ্যার দিকে একটু হয়।

হীরক বলে, এটুকুও যাবে। ভাবনা কোরো না। দিন দশেক আমি থাকছি নে। একটা ভাল চাকরির ইণ্টারভিউ পেয়েছি কলকাতায়, সেই তদ্বিরে যাচ্ছি।

বড় আনন্দ আজ রাধারাণীর। ছেলে আরোগ্যের পথে—সেই এক, আর হীরক খুব অন্তরঙ্গভাবে আজকাল কথা বলে। দশদিন আসবে না, সেই বলাটুকু যথেষ্ট। না বললেই বা কী! সেই বলার সঙ্গে আবার কতখানি কৈফিয়ৎ জুড়ে দিল—কলকাতায় ভাল চাকরির কথা, চাকরির তদ্বিরের কথা। আর একটা জিনিস—সোজাসুজি তাকায় না, কিন্তু আড়চোখে হীরক লুকিয়ে দেখে। রাধির চোখে চোখ পড়তে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি লজ্জায়। লাজুক নববধূর মতন। মজা লাগে।

কিন্তু দশ নয়, তার অর্ধেক পাঁচও নয়—তিনদিনের দিন হীরক এসে পড়ল।

এত শিগগির কাজ মিটল?

হীরক আমতা-আমতা করেঃ ভক্তির অসুখ দেখে গিয়েছিলাম, মনটা উতলা ছিল। আর আমি ভেবে দেখলাম, চাকরি নিয়ে কলকাতায় পড়ে থাকা পোষাবে না। স্বাধীন প্রাকটিশ ভাল। সেই কথা শ্বশুর মশায়কে বলে চলে এলাম।

মুখ তুলে চোখ চেয়ে আজ কথাবার্তা। রাধি উদ্বিগ্ন হয়ে বলে, কী হয়েছে চাঁপাফুলের?

মানে, সর্দিকাশির ধাত তো! বর্ষার এই সময়টা হাঁপানির টান হয় একটু—

টেম্পারেচারের চার্ট তুলে নিয়ে মনোযোগ করে দেখছে। বলে, আর কি! অমাবস্যাটা কাটিয়ে ভাত দিয়ে দাও। রোগের চিকিচ্ছে হয়ে গেল, ভিজিট পায় নি কিন্তু এখনো ডাক্তার।

তেমনি তরল সুরে রাধারাণীও বলে, বলছি তো তাই। ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি হীরক-দা?

বলতে গিয়ে থেমে বাঁ-হাতের আঙুলে আঁচল জড়াতে লাগল। সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে তারপর বলে, ইচ্ছে করে হীরক-দা, দীপকের অন্নপথ্যের দিন তুমিও এখানে বসে দুটি খেয়ে যাও। দিনের বেলা তো হবে না, রাত্রে এই যেমন সময় এসে থাক। আমার হাতের রান্না। গৃহস্থঘরের মেয়ে, বাবা খাইয়ে লোক ছিলেন, রান্নাবান্না বেশ ভালই শিখেছিলাম। খাবে?

কেন খাব না? কলকাতায় এত অজাত-কুজাত গলায় ক'গাছা সুতো ঝুলিয়ে বামুন সেজে রেঁধে রেঁধে খাইয়েছে, তোমার রান্নায় কী দোষ হল?

রাধি কেঁদে বলে, তারা অজাত হোক কুজাত হোক, সে দায় বিধাতাপুরুষের। তাদের কোন হাত ছিল না। আমি যে নিজের কাজে জাত খুইয়ে বসেছি হীরক-দা।

= ঊনিশ =

রাত্রিবেলা এই সমস্ত কথা—দীপকের ভাল হয়ে যাওয়ার আনন্দে। পরের দিন ভক্তিলতা এসে উপস্থিত। রাধি কলকণ্ঠে আহ্বান করেঃ এস ভাই চাঁপা-ফুল। অসুখ শুনে বড্ড ব্যস্ত হয়েছিলাম, ভাল আছ এখন?

জানি, জানি। অসুখ হয়ে মরে গেলে মজা জমে তোমাদের! ভক্তিলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলঃ কিন্তু সে আশায় ছাই। এমন ধারা-শ্রাবণে এত জল বসাচ্ছি, হাঁচিটি পর্যন্ত হয় না।

তক্তাপোশের কাছে এসে দীপকের গায়ে হাত দিয়ে দেখে। বলে, ছেলের জ্বর ছেড়ে গেছে তবু আমার স্বামীকে ছাড়ছ না কেন? ভাল করলাম তার শোধ তুলছ? যে পাতে খাও, সেই পাত নোংরা কর তোমরা। গলায় দড়ি জোটে না নেমকহারাম বদমায়েস পাজি মেয়েমানুষ? ভদ্রলোকের গাঁ থেকে দূর হয়ে যাও, নিজেদের পাড়া বানিয়ে নাও গে। দূর, দূর—

কাদা-মাখা স্লিপার ক্ষিপ্তের মতন ছুঁড়ে মারে রাধির দিকে। জুতো গিয়ে পড়ে দীপকের বিছানায়। ভয় পেয়ে রোগা ছেলে আর্তনাদ করে উঠল।

বুকের মধ্যে তাড়াতাড়ি ছেলেকে আগলে ধরে রাধি বাঘিনীর মতো তাকালঃ কত দিন বাছা না খেয়ে আছে, জুতো ছুঁড়লে তুমি তার গায়ে? ছেলেপুলের মা নও তুমি! বেরোও আমার ঘর থেকে, রোগা ছেলে কাঁপছে।

ততক্ষণে দরদর ধারা নেমেছে ভক্তিলতার গাল বেয়ে। বলে, রাত দুপুরে আসা-যাওয়া কোনখানে আর চাপা নেই। গ্রামসুদ্ধ ঢি-ঢি পড়েছে। সে নিন্দে মিথ্যে নয়। আগে আগে ঘুম থেকে ওকে ডেকে তুলে দিতাম। এখন সারাদিন অত খাটনি খেটে এসেও বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে, তড়াক করে নিজেই উঠে পড়ে এক সময়, দুয়োর খুলে টিপিটিপি চোরের মতো বেরোয়। বাবা কলকাতায় একটা ভাল চাকরির জোগাড় করলেন, আমিও চাই তাড়াতাড়ি নিয়ে পালাতে। তা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে ইণ্টারভিউ না দিয়ে ফিরে চলে এল। নরকের টান ধরেছে—থাকবার জো আছে বাইরে দুটো দিন সুস্থির হয়ে?

ভক্তিলতা চলে গেছে। বজ্রাহত রাধি। আরও লজ্জা, ব্যাপারটা ঘটল দীপকের চোখের উপরে। দীপক সমস্ত কানে শুনল। লজ্জার চেয়ে ভয় বেশি। দীপকের জন্যই কাশী থেকে পালিয়ে এল। পাড়ার ছেলেরা কী সমস্ত বলেছিল দীপককে। বাড়িতে এসে এক মাস্টার পড়িয়ে যেত, সেই মাস্টারকে জড়িয়ে নোংরা কথাবার্তা। বড় হয়েছে দীপক, জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে। শুনে এসে হাউহাউ করে কাঁদে। গল্প করে, হাসির কথা বলে, গঙ্গায় নৌকো

করে ঘুরিয়ে—কোনরকমে ঠাণ্ডা করা গেল না। ছেলের জন্য কাশী ছেড়ে গাঁয়ে চলে এসেছে।

সন্ধ্যার পর বার্লি খেয়ে দীপক চোখ বুজেছে। রাধিও পাশে শুয়েছে একটু। সকালবেলা ভক্তি-বউ এসে কেলেঙ্কারি করে গেল। এখনো সেই কথাগুলো ভাবে, আর জিভ কাটে মনে মনে। খোকা, তুই ভাল হয়ে ওঠ। খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যা দিকি। এ পোড়া দেশেও থাকব না। বড় হয়ে রোজগারপত্তর করবি—অনেক দূরে চলে যাব যেখানে কেউ আমাদের চেনে না, পিছনের কথা জানে না কেউ। ঘর থেকে বেরুবই না, যতদিন একেবারে বুড়ো না হচ্ছি। কিনেকেটে এনে দিবি তুই, ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে রাঁধব। বুড়ো-থুত্থুড়ে হয়ে গেলে আর তখন ভয় কি! বউ এসে যাবে ততদিনে তোর। না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি রাত্রে, বউ দুধ আর সবরিকলা নিয়ে এসে ডাকছে। ঘুমের ঘোরে বলছি, ক্ষিধে নেই, গলায় গলায় হচ্ছে মা। বউ বলছে, আপনি না খেলে কেউ আমরা খেতে পাচ্ছি নে মা, বাড়িসুদ্ধ উপোস। কত সুখ হবে আমার তুই খোকা যখন বড় হয়ে যাবি—

হাতখানা দীপকের গায়ে পড়েছে। চমক লাগে। গা যেন ছাঁৎ-ছাঁৎ করে। মিছা, মিছা। মায়ের মন ভুল করে অমনি। কিন্তু থার্মোমিটার ভুল করবে না—

একশ' একের উপর। ক'দিন সম্পূর্ণ ভাল থেকে আবার জ্বর কেন? শুধু জ্বর নয়, একটু পরে ওয়াক টানছে। যে বার্লিটুকু খেয়েছিল, হড়হড় করে বমি হয়ে বেরুল। তারপরে আরও দু-বার। নেতিয়ে পড়েছে ছেলে। চিঁ-চিঁ করছেঃ ওমা, মুখ তিতো হয়ে গেছে, মিছরি দাও। তার মানে পিত্তি বেরুচ্ছে বমি হয়ে। রাত্তিরবেলা কী করে এখন! হীরক আসবে না, ভক্তি ঠিক তাকে আটক করেছে। কোনদিন আসতে দেবে না। কালই বা সে কী করবে আবার সেই যাদব কবিরাজের শরণ নেওয়া ছাড়া?

দরজা খটখট করে ওঠে। ফিসফিসিয়ে বলে, দোর খোল—আমি, আমি।

এক নিমেষে রাধারাণী উঠে পড়ে। হীরকই তো! এমন সকাল সকাল আসে নি আর কখনো।

দরজা খুলে দিয়ে রাধারাণী কবাটের আড়ালে দাঁড়াল। হীরক ঢুকে যেতে দাওয়ায় নেমে পড়ে। কাতর কণ্ঠে বলে, আবার জ্বর হল কেন খোকার?

দেখছি— । বলে থার্মোমিটার বের করে হীরক ঝেড়ে ঝেড়ে পারা নামাচ্ছে। ঝাড়ছে তো ঝাড়ছেই। দৃষ্টি বাইরের দিকে—রাধি কথা বলছে যে অন্ধকার দাওয়া থেকে। ঘুমন্ত দীপকের একটা হাত সে উঁচু করে ধরল।

রাধি বলে, হাড্ডিসার হয়ে গেছে খোকা। বগলে তাপ উঠবে না, তুমিই তো সেজন্য থার্মোমিটার মুখে দিতে বলেছ।

হীরক বেকুব হল। মুখের ভিতর থার্মোমিটার দিয়ে বলে, কী হয়েছে বল এইবারে শুনি।

বমি তিনবার হয়েছে। জ্বর। তবে পেট ফাঁপে নি দেখলাম।

বিরক্ত হয়ে হীরক বলে, অত দূর থেকে কথা ছুঁড়লে তো হবে না। সামনে এসে ভাল করে বল।

রাধারাণী একটু চুপ করে থেকে বলে, কেন যাচ্ছি নে তুমি তো দেখেছ হীরক-দা। কাপড়ের উপর খোকা বমি করেছে, সে কাপড় কেচে দিয়েছি। যা পরে আছি, সামনে যাবার উপায় নেই।

কিন্তু হীরকই উঠে ইতিমধ্যে দরজায় চলে এসেছে। হাত খানেকের ব্যবধান। বলে, হ্যাঁ, বল এইবার সমস্ত।

রাধারাণী আবার আদ্যন্ত বলে গেল। কানে যাচ্ছে কি কিছু হীরকের? সার্চলাইটের মতন নজর ফেলছে কেবলই রাধারাণীর উপর। কথা শেষ হয়ে গেলে বলে, হুঁ পেট ফেঁপেছে, তার উপরে জ্বর। মুশকিল হল দেখছি।

রাধারাণী তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে, পথ দাও। আমি ঘরে আসছি।

হীরকের দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে সে দীপকের শয্যার উপর বসল। পাশের টুলখানা দেখিয়ে বলে, বস এখানে। ভাল হয়ে বসে জিজ্ঞাসাবাদ কর।

শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া পরনে। মনকে প্রবোধ দেওয়া--একটা-কিছু পরা আছে, একেবারে উলঙ্গ নয়। এক-পা এক-পা করে এসে হীরক টুলে বসে পড়ল।

অসুখের কথা কিছুই তুমি শুনলে না হীরক-দা। মন খারাপ বুঝি?

এবারে হীরক অনেকগুলো কথা বলে ফেলেঃ ভক্তি একেবারে ক্ষেপে গেছে। মানুষজন মানে না, কিছু না। কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ওর ধারণা, মজে গেছি আমি তোমার ভালবাসায়।

ফিকফিক করে হাসে হীরক। এ হাসি রাধারাণীর অনেক দেখা আছে। কিন্তু হীরকের মুখে ভাবতে পারা যায় না। গা ঘিনঘিন করে, হাত-পা যেন অসাড় হয়ে আসে।

হেসে হেসে হীরক বলছে, বোকা তো আবার এদিকে! মেজাজ দেখিয়ে দুয়োরে খিল এঁটে দিল। দিল তো দিল—বয়ে গেছে আমার খোশামুদি করতে! বৈঠকখানায় শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, যেমন মিথ্যে বদনাম দেয় তার আজ শোধ তুলব। আজকেই—

খপ করে রাধির হাত চেপে ধরে।

এ কী হীরক-দা?

ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো হীরক অসহ আবেগে ধুঁকছে। রাধারাণী কাতর হয়ে বলে, তোমার পায়ে পড়ি হীরক-দা। ছেলের আবার নতুন করে জ্বর হল। আমার মনের অবস্থা বুঝে দেখ একবার।

হীরক উড়িয়ে দেয়ঃ ওটা কিছু নয়। এ রোগের দস্তুর এই। যাবার মুখে একবার দু-বার ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। জ্বর দেখে ভয় পাবার কিছু নেই।

আবার সেইরকম হাসি হাসছে। বলে, ডাক্তারের ভিজিট না দিলে অসুখ সারে কখনো? ভিজিট শোধ কর, জ্বরও দেখবে নেই। লিখিত গ্যারাণ্টি দিতে রাজি আছি।

রাধিকে জোর করে আলিঙ্গনে বেঁধেছে। বলি-দেওয়া ছাগলের মতো অসহায় রাধি হাত-পা ছুঁড়ছে। হীরক খিঁচিয়ে ওঠেঃ ঢং ছাড় দিকি। বড্ড যে সতীপনা!

রাধি কেঁদে বলে, সতী আমি নই—দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে। কিন্তু আমি যে তোমায় সকলের থেকে আলাদা ভাবতাম হীরক-দা। অসতী বলে ঘেন্না কর, তাই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম এত দিন।

হীরক জড়িত কণ্ঠে বলে, ঘেন্না—হুঁ, ঘেন্না বই কি! কোন্ ছুঁচো বলেছে? ভক্তি ঝগড়া করে। বলে, ভালবাসায় আমি মজে গেছি। সত্যি সত্যি তাই।

রাধি বলে, সত্যি যদি হয়, মুখে আগুন তোমার। নিজের চেয়ে বেশি কাউকে তো লোকে ভালবাসে না—আমিই ঘেন্না করি নিজেকে। নিজের এই দেহকে। এই মুখ এই ঠোঁট যত কামুকের থুতু মেখে মেখে নোংরা হয়ে গেছে। ধারালো ছুরি দিয়ে এক পর্দা যদি তুলে ফেলতে পারতাম, তবে শান্তি।

বলতে বলতে থেমে পড়ে হঠাৎ। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন দৃষ্টিতে দেখে হীরকের কাণ্ড। বলে, ছাড় হীরক-দা একটুখানি। এ চেহারা তোমার দেখতে পারছি নে।

পাগলের মতন ছুটে গিয়ে হেরিকেন নিভিয়ে দিল। অন্ধকার।

হীরকের কণ্ঠ বড় মধুর এখন। পাখির কলকাকলি। বলে, ভেব না রাধি। তোমার ছেলের জন্য ভাবনা নেই। অসুখ সারানো শুধু নয়, ভাল ভাল পথ্যের ব্যবস্থা করে একমাসের মধ্যে চেহারা কী করে দিই দেখো। আমি রোজ আসব।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে রাধারাণী বলে, যেও না হীরক-দা। খোকার কাছে একটু বস। আমি আসছি।

কোথায় যাও?

দীঘির ঘাটে দুটো ডুব দিয়ে আসি।

জোরবাতাস দিয়েছে বাইরে, টিপটিপে বৃষ্টি। হীরক অবাক হয়ে বলে, কী সর্বনাশ! এই রাতে এখন দীঘিতে যাচ্ছ?

রাতের রাক্ষুসি আমি যে, আমার কে কী করতে পারে? ডুব দিয়ে অমনি ঠাকুরবাড়ির রোয়াকে মাথা ঠেকিয়ে আসব আমার খোকার নাম করে।

দীঘির ঘাটে ডুবের পর ডুব দিচ্ছে। মা গঙ্গা, পতিতপাবনী সনাতনী, গা জ্বালা করছে, জুড়িয়ে দাও। পাপের পুঁজরক্ত থিকথিক করছে সর্বদেহে, সাফসাফাই করে দাও।

পরের রাতে হীরক আবার এসেছে। ডাক্তারি-ব্যাগের সঙ্গে কাপড় একখানা, আর বড় ঠোঙায় বেদানা-কমলালেবু। মিহি বুননের ভেলভেট-পাড় ধুতি। ধুতিখানা মেলে ধরল। বলে, সাইকেল নিয়ে নিজে গঞ্জে গিয়ে পছন্দ করলাম। তোমায় মানাবে ভাল। শাড়ি হলে আরও মানাত, কিন্তু বিধবার যে পরবার জো নেই।

রাধি সভয়ে বলে, চাঁপাফুল দেখে নি তো?

দেখবে কি করে? বাপের বাড়ি চলে গেছে। চেঁচিয়ে কেঁদে এক-হাট মানুষ জড় করল যাবার মুখটায়। তোমাদের টুনিটাকেও নিয়ে গেল। টুনি তার মাকে একবার দেখে যাবে বলে এদিকে আসছিল—তা হাত ধরে হিড়হিড় করে গরুর-গাড়িতে তুলে দিল। যাকগে, আপদ গেছে। পর দিকি কাপড়টা, কেমন হয় দেখি।

রাধি ব্যঙ্গের স্বরে বলে, আস্ত কাপড় কেন আনতে গেলে? ছেঁড়া কাপড়েই তো মজা ছিল বেশ। ও, বুঝেছি হীরক-দা। কাপড় পরার পরে নয়—পরার সময়টা দেখতে চাও বুঝি তুমি?

হীরক চোখ পাকিয়ে বলেঃ বড্ড সে কথার ধার। আমি নিজে আসি নি এ-বাড়ি। ভক্তি পাঠিয়েছিল তোমারই গরজে। আচ্ছা, চলে যাচ্ছি—

গরগর করতে করতে উঠে পড়ল। রাধারাণী ঝাঁপিয়ে পড়েঃ যেও না। একটি কথাও বলব না আর হীরক-দা। তুমি রাগ করে গেলে খোকার চিকিচ্ছের কি হবে? সত্যিই তো, অনেক ভিজিট পাওনা আছে তোমার। কিসে শোধ হয়ে যায় বল। এতদিনের ভিজিট, তার উপরে ওষুধ আর লেবু-বেদানার দাম। কাপড়ের দামের কথা তুলব না, তা হলে আবার রেগে যাবে। কিন্তু কোনদিন কেউ আমায় ছাড়ে নি। এমনি কেউ কিছু দেয় নি। কাশীতে খোকার মাস্টার মাইনে শোধ করে নিয়েছে, বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়া আদায় করেছে। একটা ভাণ্ডার থেকেই সমস্ত।

আকুল কণ্ঠে বলে, তোমার পায়ে পড়ছি হীরক-দা, মুখ গোমড়া করে থেকো না। শোধবোধ করে নিয়ে ছেলের যাতে অসুখ সারে, তাই করে দাও।

হীরক আর নতুন কী করবে! দেহ একখানা শুকনো কাঠ—জীবন নেই, অনুভূতি নেই। পেতে দেয় সেই কাঠখানা—যার যেমন খুশি লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নেচেকুঁদে যায় তার উপরে। মনের উপরেও এমনি পক্ষাঘাত এনে দাও ঠাকুর গোপাল। ভক্তিলতার মতো সরল উপকারী মেয়ের সর্বনাশ করে আর হীরকের মতো শিক্ষিত বলিষ্ঠ মানুষকে পশু বানিয়ে—তারপরেও রাধি যেন হি-হি করে হাসতে পারে।

দীপক সেইদিনই কেবল অন্নপথ্য করেছে। হঠাৎ এক কাণ্ড। রোগির তক্তাপোশ মচমচ করে উঠল। জেগে পড়েছে দীপক, চোখ মেলে তাকিয়েছে। তাকিয়ে থাকা শুধু নয়, উঠে দাঁড়াল রোগা ছেলে। পা টলমল করছে। এক্ষুণি বুঝি পড়ে যায়।

হীরক অক্টোপাস হয়ে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়ানো কী যায়! এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে রাধি ছুটে গিয়ে ছেলে ধরতে গেল। অমনি কে যেন সপাং করে চাবুকের বাড়ি মারে। দেহে নয়, দেহের উপর মারলে রাধির লাগে না। বুকের মধ্যে চাবুকের ঘা পড়লঃ অশুচি তুমি। ঠাকুরবাড়ি যেমন ঢুকতে মানা, ছেলেও ছোঁয়া চলবে না তেমনি। ছেলের অকল্যাণ হবে।

দীপক আকুল হয়ে কাঁদছেঃ থাকব না আর এখানে। চলে যাব, এক্ষুণি যাব।

হীরক দোর খুলে চোরের মতন নিঃশব্দে কখন সরে পড়েছে। দীপকও শুয়েছে আবার। দাঁড়ানোর বল নেই—কী ভাগ্যি, মুখ থুবড়ে পড়ে যায় নি।

কাশীর সেই মাস্টার মশায়ের কথাগুলো মনে পড়ছে—দীপককে যিনি পড়াতেন। মাইনে আদায়ের বেলা যা-ই হোন, শিক্ষক অতিশয় উপযুক্ত। ছাত্রের কিসে হিত হবে, সেদিকে তীক্ষ্ন নজর। বলতেন, শিশুর চরিত্রে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব খুব বেশি পড়ে। চোরের ছেলে চোরই হয় সাধারণত। এ জায়গা থেকে দীপককে কোন বোর্ডিং-এ রেখে দাও। মাঝে মাঝে টাকা পাঠিও।

প্রায়ই বলতেন। মায়ে ছেলেয় আলাদা হয়ে যাবে, রাধারাণী তা সইতে পারে না। একদিন সে জবাব দিলঃ আপনারও তখন তো কাজ থাকবে না মাস্টার মশায়। হপ্তায় হপ্তায় মাইনে আদায় হবে কেমন করে?

রাধারাণীর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন মাস্টার মশায়। রাগ করে বললেন, ঠকাচ্ছ কিন্তু তুমি। হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপার এটা—এমন নিম-

খাওয়া মুখ করবার কথা তো নয়। তোমার কাছ থেকে এরকম মাইনে নিয়ে নিয়ে ঘেন্না ধরে গেছে। ছেলে সরাও বা না সরাও, আমি আর দীপককে পড়াতে আসব না।

মায়ে-ছেলেয় কাশী ছেড়ে নতুন জায়গায় বেরিয়ে পড়বে, তখন থেকেই ঠিক করেছে। নিষ্কলংক নতুন পথ ধরবে। রাধি নিজের বাপ-মা'কে কোনদিন ভয় করে নি, কিন্তু ওই এক ফোঁটা ছেলেকে বাঘের মতো ডরায়। ছেলে নয়, এক কঠিন বিচারক। কোন রকম বেয়াদপি চলবে না তার সামনে। কিন্তু যে শংকায় পালিয়ে এতদূরের কাপাসদা'য় চলে এসেছে, ঠিক সেই কান্ড ঘটে গেল আজকে। হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। বিচারক রায় দিচ্ছেঃ পাপিনীর শাস্তি নিসংগ নির্বাসন--ছেলে কোলেপিঠে নিয়ে থাকার ইতি এবারে। অস্থির দীপক বালিশের উপরে মাথাটা ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করে। আর কাঁদেঃ আমি থাকব না মা, এখানে আমি থাকব না। চোখের জল গড়িয়ে তার বালিশ ভিজে গেল।

রাধারাণী সান্ত্বনা দিয়ে বলে, যাবি বই কি বাবা। এ কী একটা থাকবার জায়গা রে! সেরে ওঠ, গায়ে একটু বল হোক, আমি সঙ্গে করে দিয়ে আসব খুব ভাল এক জায়গায়।

চোখের জল মুছিয়ে দেবে, একটু আদর করবে ছেলেকে—কিন্তু উপায় তো নেই। ছোঁয়া যাবে না। ডুব দিয়ে আসবে রাধারাণী, কিন্তু এই রাত্রে ছেলে একলা ফেলে যায় কেমন করে? স্নান হবে না, সমস্তক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র মুখের সান্ত্বনা দেবে যতক্ষণ না দীপকের ঘুম এসে যায়।

দ্বিধা কাটিয়ে রাধারাণী মতলবটা মনে মনে পাকা করে ফেলল। না না, আমার কাছে আর নয় রে খোকা। বেশ তো বড় হয়ে গেছিস—এবারে ভাল একজনের কাছে গিয়ে থাকবি। আমার মামাতো বোন—মামার বড় মেয়ে আরতি। কলকাতায় মস্ত বাড়ি, মোটরগাড়ি, ছেলেমেয়ে, সুখশান্তি, মান-ঐশ্বর্য। আরতি নিয়ে গিয়ে মায়ের মতন দেখবে তোকে। ঠিক যেন নিজের মা। তিলডাঙায় চলে যাব সোমবারের দিনও নয়—আরও একটা দিন বাদ দিয়ে। মঙ্গলবারে গিয়ে সমস্ত ঠিকঠাক করে আসব।

= একুশ =

তিলডাঙায় হারাণ মজুমদারের সর্বশেষ মেয়ে উৎপলার বিয়ে হয়ে গেল এই শনিবারে। ডাকযোগে একটা ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছিল রাধারাণীর নামে। শুধু সেই চিঠির ছাপা দেখেই বোঝা যায়, জাঁকজমকের বিয়ে। বাড়ির শেষ কাজে আরতি এসেছে নিশ্চয়। শনিবারে বিয়ে, রবিবারে কনে-বিদায়। উৎসব-ক্লান্ত মানুষের বিশ্রামের জন্য সোমবারটাও বাদ দিয়েছে। দীপককে পরের দিন সকাল সকাল খাইয়ে তারা-দিদিকে কাছে বসিয়ে রেখে রাধি তিলডাঙায় চলল। একটা-দুটো কথা—কতক্ষণ আর লাগবে! সন্ধ্যার আগে ফিরবে। নিজে না গিয়ে তো উপায় নেই।

দেবদারু-পাতার ফটক করেছিল বিয়ে-বাড়ি, পাতা শুকিয়ে এসেছে। রাধি ভিতরে ঢুকল না। কী জানি, সন্ধ্যা হয়তো তেড়ে আসবে ঝাঁটা নিয়ে। ফটকের পাশে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

হারাণ মজুমদার বাইরে থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন, ভূত দেখেছেন যেন।

কে রে—রাধি? কী খবর? নেমন্তন্ন-চিঠি পেয়েছিলি আমার?

রাধি বলে, চুকেবুকে গেছে কিনা, তাই কথাটা বলতে পারছ। সত্যি সত্যি এসে পড়তাম যদি?

এলে কী আর হত! যজ্ঞিবাড়ি শতেক জাত তো এসে পাত পেড়ে গেল।

তুমি কিন্তু বলেছিলে মামা, সব মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আবার এখানে আমায় নিয়ে আসবে।

সদুঃখে হারাণ বলেন, সবার হল আর কোথায়? নাতনি হয়েছে আবার যে দুটো। মোহিতের দুই মেয়ে।

হাসি আসে রাধারাণীরঃ সে তো বটেই। এই নাতনি দুটো পার হতে হতে আরও কি নাতনি হবে না? তোমার নাতনি সবগুলোকে পার করতে করতে মোহির-দা'রও ওদিকে নাতনি হতে থাকবে। ভয় নেই, থাকতে আসি নি আমি মামা। আরতিকে একটিবার ডেকে দাও, তার সঙ্গে কথা আছে।

হারাণ ইতস্তত করেনঃ আজকে হবে না মা। বাড়ি-ভরা কুটুম্ব। আমার বড় জামাই—নন্দদুলাল বাবাজিও আছেন। এর মধ্যে কথাবার্তা কখন হয়! আর একদিন।

দৃঢ়কণ্ঠে রাধি বলে, এত পথ এসেছি, কথা আজ বলবই। জোর-জবরদস্তি কিছু নয়। কথা বলেই চলে যাব। ডেকে দাও।

আরতি পান সাজছিল। রাধারাণী ডাকছে শুনে তারও মুখ পাংশুঃ যাব না। কাজকর্ম ফেলে কী করে এখন যাই? দরকারটা কী, ওখান থেকেই শুনে এলে না কেন বাবা?

আরতির স্বামী নন্দদুলাল সেখানে। সে বলে, ঘেন্না কর সে জানি। ওই চরিত্রের মেয়েমানুষ কোন্ গেরস্ত-বউ ঘেন্না না করবে? তবু বোন তো বটে! আশা করে এদ্দূর চলে এসেছে, মন নরম করে একবার দেখে আসা উচিত।

হেসে বলে, দরকার অবিশ্যি বোঝাই যাচ্ছে। অভাবে পড়েছে। ও লাইনের এই হল দস্তুর। যাদের সঙ্গে আনাগোনা, তারা সব শয়তান-ধড়িবাজ, অসুবিধা বুঝলে পিঠটান দেয়। সবে কলির সন্ধ্যে, এখনো হয়েছে কি! তবে বাড়ি বয়ে এসেছে, দিয়ে দাও গোটা কয়েক টাকা-

সুপুষ্ট মণিব্যাগটা বের করে নিয়ে নন্দদুলাল নিজেই চলল। যখন যাচ্ছে · কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরিয়ে পড়ে—আরতিরও যেতে হয় পিছু পিছু।

রাধারাণী সজল চোখে বলে, টাকা নয়। ছেলেটাকে আর বাঁচাতে পারছি নে। সেই ভার নিয়ে নিক আরতি।

প্রস্তাব শুনে নন্দদুলাল এক-পা পিছিয়ে যায়ঃ একটা আস্ত ছেলের যোল আনা ভার নেওয়া—যে-সে ব্যাপার নাকি? আর, তোমার কুলোজ্জ্বলকারী ছেলে তো—পেট থেকে পড়লেই ওসব বাচ্চার গালে নুন পুরে মেরে ফেলে। মায়া করে বাঁচিয়েছ তো অন্য লোকে নিতে যাবে কেন?

আরতির দিকে চেয়ে সাক্ষি মানেঃ অ্যাঁ—কি বল?

আরতি কিন্তু করুণা-বিগলিত। বলে, অমনি একটা দশ-বার বছরের ছেলে বাড়ি থাকলে বড্ড সুবিধা হয়। দোকানে ছুটে গিয়ে এটা-ওটা এনে দিল, ভদ্রলোক এলে বৈঠকখানা খুলে বসতে দিল, চাইকি মেজ খুকীর টিফিনের সময় খাবারের কৌটো দিয়ে এল ইস্কুলে।

স্ত্রীর কথার উপরে কথা নেই। নন্দদুলালের মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যায়ঃ তবে নিয়ে চল। ভালই হবে। এই রকম একটা ছেলেরই দরকার বটে।

রাধারাণীর কথা আছে তবুও। বলে, খাটিয়ে নিলেই হবে না কেবল। ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, মানুষ হবে দীপক—

ভ্রূভঙ্গি করে নন্দদুলালঃ ও, ইস্কুলে পড়ে বুঝি বিদ্যেসাগর হবে? এঁটোপাতের ধোঁয়া স্বর্গে গিয়ে উঠবে, আম্বা দেখে বাঁচি নে।

কিন্তু আরতির করুণার শেষ নেই। তাড়া দিয়ে উঠল নন্দদুলালের উপরঃ ওসব কী জন্যে বলছ? না হয় করপোরেশনের ইস্কুলে ভর্তি করে দেব। ফ্রী পড়বে, এক পয়সা তোমার খরচা হবে না।

নন্দদুলাল তাড়াতাড়ি বলে, খরচার জন্য কে বলছে? যতই হোক, সম্পর্কে বোন-পো হল তোমার। ছেলের যদি মাথা থাকে, পড়াশুনো ভাল ভাবে করে, আলবৎ পড়াব। যদ্দুর পড়তে চায় পড়াব।

আরতি বলে, ইস্কুলেই পড়বে দীপক, ঘরের ছেলের মতো থাকবে। আমাদের কলকাতা ফিরতে আরো ছ-সাত দিন। যাবার আগে লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসব। তদ্দিনে ছেলেও তোমার আর খানিকটা সুস্থ হোক।

অন্য লোক নয়, হারাণ মজুমদার নিজে দীপককে নিতে এসেছেন। চাপা গলায় বলেন, বুঝিস তো, বাইরের লোক এর মধ্যে ঢুকতে দেওয়া যায় না। তুই আমি আর আরতি—এই যা তিন প্রাণীর মধ্যে রইল।

রাধি ছেলে সাজাচ্ছে। অবস্থা যেমনই হোক, দীপকের জুতো-জামা-হাফপ্যাণ্টে-কৃপণতা নেই। ধোপা বন্ধ তো বয়ে গেল। ক্ষারে কেচে ধবধবে করে এই ক'দিন বিছানার নিচে রেখে দিয়েছিল। ধোপার ইস্ত্রিতে এর চেয়ে বেশি আর কী হত!

দীপকের রং একটু ময়লা বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। টানা-টানা চোখ দুটি, থোপা-থোপা চুল। পোশাক পরিয়ে চুল আঁচড়ে দিয়ে রাধারাণী কয়েক পা পিছিয়ে দু-চোখ ভরে দেখে। চোখ আর ফেরানো যায় না। রাজপুত্র। নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র চলে যাচ্ছে, বনবাসে নয়—শহর কলকাতায়। কত আরামের জায়গা—পিচের রাস্তা, কলের জল, বিদ্যুতের আলো। সকলের চেয়ে বড় আরাম—মানুষের সমুদ্র সেখানে। কেউ কারো পিছনের খোঁজ রাখে না। আরতির ছেলে হয়ে গেল দীপক—খাতির-সম্মান কত!

মনে মনে বলে, তোর সকল লজ্জা এবারে ঘুচে গেল রে খোকন। একটা খারাপ মেয়েমানুষের ঘরে দশ বছর বড় হয়েছিস, কোন দিন কেউ টের পাবে না। সাধ্বীসতী আরতির ছেলে এবার থেকে তুই।

ভাবছে এই সব। আর মুখেও তাই বলে, ভারি শহর কলকাতা—বড় সুখের জায়গা। মুখ আঁধার করিস কেন খোকন? তোর নতুন-মা বড় ভাল, এক কথায় কেমন নিয়ে নিল। আমার কথা মনেও পড়বে না।

সেই যে মাস্টার মশায় সৎ পারিপার্শ্বিকের কথা বলতেন—ঠিক তাই একেবারে। আরতির মতো ভাগ্যধরী হয় না। ঘর-গৃহস্থালী, ছেলেমেয়ে, অনুগত স্বামী—দুর্গা-প্রতিমায় ঠিক যেমনটি দেখতে পাই। কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, পায়ের নিচে ভোলা-মহেশ্বর অবধি—হি-হি-হি—

দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে দীপক উচ্চকিত ওই হাসির শব্দে থমকে দাঁড়াল।

কী হল রে—অ্যাঁ? দাঁড়ালি কেন খোকন?

হারাণের দিকে চেয়ে রাধি তাড়া দিচ্ছেঃ চলে যাও মামা। বেলা হয়ে যায়, দেরি করছ কেন? স্টেশন কম পথ নয়, রোদে কষ্ট হবে। যাও, চলে যাও তোমরা।

তখন হারাণের আর একটা কথা মনে পড়ে যায়। ঘরের মধ্যে রাধিকে ডেকে নিয়ে বলেন, এই টাকাটা আরতি পাঠিয়ে দিয়েছে। বিস্তর করেছিস তুই, সে ঋণের শোধ হয় না—

টাকা রাধির হাতে দেন নি, তক্তাপোশের উপর রাখলেন। হাতের ঠেলায় সেগুলো মেজের উপর ছড়িয়ে রাধারাণী কেটে কেটে বলে, গরু-পোষানি দেয় মামা, আরতি ভেবেছে তেমনি ছেলে পোযানি। ভাগ্যবতী তোমার মেয়ে- ভাল ঘরবর হয়েছে, টাকাকড়ি হয়েছে। কিন্তু টাকায় আমার গরজ নেই, কুড়িয়ে নিয়ে যাও।

ছেলে আবার আরতির কাছে চলে যাচ্ছে, হারাণ প্রসন্ন নন এই ব্যাপারে। দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে বলেন, না, টাকার অভাব কি তোর? ছেলেটা সরিয়ে দিয়ে আরও ঝাড়া হাত-পা হলি। টাকা তো বাতাসে উড়ে উড়ে আসবে।

দীপক নেই, কেউ নেই। দুনিয়ার সবাই ভাল রইল, আরতি ভাল—রাধিই কেবল ভাল থাকতে পারল না। বড়ঘরে সে একা। আর রান্নাঘরে তারা-পাগলি জেগে বসে কখনো বিড়বিড় করে আপন মনে, কখনো বা হাঁকাহাঁকি করে ঠাকুর গোপালের উদ্দেশে। যে ঠাকুর একটা দিনের ভিতর তার পুরো সংসার নিয়ে নিলেন—কৈলাস সতীশ আর সোনামণি ধড়ফড় করে মরল, একসঙ্গে বেঁধে শ্মশানে নিয়ে গেল। কিন্তু তা বলে মানুষের কী অভাব রাধি সুন্দরীর? দগদগে ঘা দেখলে মাছি আপনি এসে ভনভন করে, তাড়িয়ে পারা যায় না।

কিন্তু ওই যে পাগলি তারা—দরদ যা-কিছু ওই একটা মানুষের। আবোল-তাবোল কথাবার্তার মাঝে সেটা বোঝা যায়। যত রাত হয়, তারার পাগলামি বাড়ে। ইদানীং আবার একটা ডাল ভেঙে রাখে হাতের কাছে। গোপালের সঙ্গে শুধুমাত্র মুখের কোন্দল করে জুত হয় না। বেড়ার উপর সপ-সপ করে ডালের বাড়ি মারে। তারই মধ্যে এক একবার চেঁচিয়ে উঠছেঃ ওই মরল রে রাধিটা নোংরা মাড়িয়ে—

শীতটা বড় পড়েছে এবার। শীতের মধ্যে তুরতুর করে গিয়ে রাধি দীঘির জলে ডুব দেয়। তারার কান বড় তীক্ষ্ণ—জলের শব্দ শোনে আর চেঁচায়। ডুব দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে রাধি ফিরে আসে—গায়ের জ্বলুনি গেল, অশুচি বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হল।

কিন্তু কতক্ষণ! আবার যেতে হয় দীঘির ঘাটে। আবার ডুব। শীতের দীর্ঘ রাত্রের মধ্যে পাঁচবার সাতবার ডুব দিয়ে আসে এক একদিন। আর

তারা চেঁচামেচি করে : মরবি রে পোড়াকপালি। মরবি, মরবি। বড্ড নোংরা ঘাঁটছিস। ডুব দিতে দিতেই মারা পড়বি।

তারপরে একদিন দেখা যায়, রাধারাণী নেই। গ্রাম ছেড়েছে। কাপাসদা'র অভিশাপ বিদায় নিয়েছে। সেই সঙ্গে দেখা গেল, এমন পশার-প্রতিপত্তি ছেড়ে হীরক ডাক্তারও উধাও। তুমুল রসাল আলোচনা। সেই সঙ্গে গালি-গালাজ রাধির নামে : ডাকিনী মাগি দেবতার মতন মানুষটা গুণ করে নিয়ে চলে গেল। এমন একজন পাশ-করা ডাক্তার চলে যাওয়ায় গাঁয়ের ইতরভদ্র মাথায় হাত দিয়ে পড়েছে।

মাস কয়েক পরে হীরক ডাক্তারের খবর হল। না, রটনা বোধহয় মিথ্যা। কলকাতায় চাকরি নিয়েছে হীরক, বউ ছেলেপুলে নিয়ে সুখেই আছে। কিন্তু রাধারাণীর কথা কেউ বলতে পারে না।

= বাইশ =

কতকাল পরে সেই রাধারাণী বাড়ি এসেছে। হাটুরে মানুষরা প্রথম তাকে দেখে। সে রাধি নেই, পাপের দাগ সর্ব অঙ্গে। মা মনোরমা মায়া করে এসিড ঢালেন নি, বিধাতাপুরুষ নিষ্ঠুর হাতে তাই বুঝি ঢেলেছেন।

তারা-পাগলি মারা গেছে অনেকদিন। রান্নাঘরটা গেছে। বড়ঘরের দেয়াল ভাঙা, চালে খড়কুটো নেই, মাটির মেজেয় গোছা গোছা উলুঘাস জন্মেছে। পাকা শালের খুঁটি বলেই চাল ক'খানা রয়েছে খুঁটির উপরে। কখন পেঁছিল রাধি, কার সঙ্গে এল—কোন পুরানো প্রেমিক খুব সম্ভব দয়া করে রেখে গেছে। রাধি হয়তো ভেবেছিল—ঘর আছে, তারা-দিদি আছে, ধানজমি ও বাগবাগিচা আছে। গিয়ে পড়লেই নিশ্চিন্ত। বেগতিক দেখে সঙ্গের সাথী তাকে লিচুতলায় ফেলে চলে গেল। তা বড়ঘরের উলুবনের চেয়ে ছায়াময় লিচুতলাটা অনেক বেশি সাফসাফাই।

রাত্রিবেলা সেইখান থেকে রাধি চেঁচাচ্ছে ঃ এই, এইও- মেরে ফেলব। এই, এইও—

খ্যা-খ্যা আওয়াজ তুলে শিয়ালে শিয়ালে ঝগড়া। গঞ্জের হাট করে গঙ্গেশরা পাঁচ-সাতজন বাড়ি ফিরছে। হাতে লণ্ঠন, কাঁধের ধামায় হাটবেসাতি, গল্প করতে করতে যাচ্ছে।

মানুষের সাড়া পেয়ে শিয়াল পালিয়ে যায়। আলো দেখে রাধারাণী আর্তনাদ করেঃ ওগো, কারা তোমরা—দেখে যাও। নড়বার ক্ষমতা নেই—শিয়ালে ধরে টানছে।

ঠাহর করে দেখে গঙ্গেশ বলে, দেখতে পাচ্ছ? স্বর্গ-নরক সবই এইখানে—এই পিরথিমের উপর। পাপের শাস্তি হাতে হাতে। জ্যান্ত মানুষ খুবলে খুবলে শিয়ালে খায়।

হাল আমলের নাস্তিকও কিছু কিছু আছে, তারা পাপের শাস্তি ও পুণ্যের জয় দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরতে পারে না। তেমনি ক'জনে কাঁধের ধামা নামিয়ে রেখে ভিটার উলুঘাস কতকটা উপড়ে রাধিকে চালের নিচে তুলে দিল। পাটকাঠির আঁটি বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিল, জ্বলবে অনেকক্ষণ। আগুন যতক্ষণ আছে, শিয়াল এগুবে না। একগাদা মাটির ঢিল এনে রাখল হাতের কাছে। আর কোথাকার এক বাতিল ভাঁড় সংগ্রহ করে দীঘি থেকে ভরে এনে দিল। বলে, নড়তে না পার, হাতে আর মুখে তো জোর আছে তোমার। চেঁচাবে আর ঢিল ছুঁড়বে, শিয়ালে কায়দা করতে পারবে না। তেষ্টা পেলে ভাঁড়ের জলে কাপড় ভিজিয়ে মুখের মধ্যে দিও।

অনেক করল তারা। ব্যবস্থা করে দিয়ে যে যার ঘরবাড়িতে গেল। সারা রাত ধরে রাধারাণী চেঁচায়, ঢিল ছোঁড়ে। ক্ষণে ক্ষণে চেতনা স্তিমিত হয়ে যায় কেমন। যেন সে ছোট মেয়ে হয়ে গেছে আবার, গ্রামময় উলু দিয়ে দিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। চণ্ডীমণ্ডপ-জোড়া দুর্গা-প্রতিমা। ঠাকরুনের ডাইনে বাঁয়ে কার্তিক-গণেশ লক্ষ্মী-সরস্বতী......

বাতাসে নিবন্ত পাটকাঠির আগুন দপ করে এক-একবার জ্বলে ওঠে। সেই আলোয় শিয়াল দেখতে পায়। খানিক খানিক জমাট-বাঁধা অন্ধকার যেন। লুব্ধ হয়ে আছে তারা, গুটিগুটি এগুচ্ছে। সুযোগ পেলেই এসে ধরবে। তার সেই রূপময় যৌবনে নাগরেরা যেমন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত দেহের উপর। আতঙ্কে গলার সকল জোর দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেঃ এইও, এইও। ঢিল ছোঁড়ে এদিক সেদিক।

সকাল হল। লিচুর ডালে কাক এসে বসছে। শকুন উড়ছে মাথার উপর। সবাই কেমন টের পেয়ে যায়। তার সোনার যৌবনে যখনই যে জায়গায় গিয়েছে, লম্পট পুরুষগুলো পিছনের কথা আপনা-আপনি যেমন টের পেয়ে যেত। শকুনের দল নেমে এসে অদূরে রান্নাঘরের ভিটায় বসে গেল সারি সারি। ঘাড় বাঁকিয়ে শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। প্রবীণ পণ্ডিতেরা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ওই যেন পুঁথিপত্রের বিধান দিতে বসে গেছেন।

প্রহরখানেক বেলায় রাধি বাড়ির ভিটার উপরে চোখ বুজল।